# ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

**ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ**

## খ বিভাগ: আসরারুশ শরীয়াহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

## হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বিষয়ভিত্তিক)

২১. "মাবাহাসুস সাআদাহ" (সৌভাগ্যের আলোচনা) অধ্যায়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ সৌভাগ্যের মূলনীতিগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? (كيف شرح الشاه ولي الله المبادئ الأساسية للسعادة في "مبحث السعادة"؟)

২২. "আল-বিরর" (সৎকাজ/পুণ্য) ও "আল-ইছম" (গুনাহ/পাপ)-এর মধ্যকার পার্থক্য ও সম্পর্ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) কীভাবে আলোচনা করেছেন? (كيف ناقش الشاه ولي الله الفرق والعلاقة بين "البر" و "الإثم"؟)

২৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, মানবাত্মা ও সমাজের উন্নতিতে সৎকাজের প্রভাব কীরূপ? ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়? (ما هو تأثير البر على تزكية النفس والمجتمع عند الشاه ولي الله؟ وكيف ينعكس على الحياة الفردية والاجتماعية؟)

২৪. গুনাহ বা পাপ (আল-ইছম) কেন মানবাত্মার জন্য ক্ষতিকর? গুনাহের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ"-এ কী বলা হয়েছে? (لماذا يعتبر الإثم ضارا للنفس البشرية؟ وماذا ذكر في "حجة الله البالغة" حول أسباب الإثم وعلاجه؟)

২৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, শরীয়তের বিধানাবলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়া) কী? এটি বিরর ও ইছম-এর ধারণাকে কীভাবে সমর্থন করে? (ما هي أهداف ومقاصد الشريعة عند الشاه ولي الله؟ وكيف تدعم هذه المقاصد مفهوم البر والإثم؟)

২৬. "আল-বিরর" অর্জনের ক্ষেত্রে "ইহসান" (উত্তম আচরণ)-এর ভূমিকা কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে মানব আচরণের সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা করেছেন? (ما هو دور الإحسان في تحقيق "البر"؟ وكيف شرح الشاه ولي الله دقة السلوك البشري؟)

২৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে সৌভাগ্য (সাআদাহ) বলতে কী বোঝায়? এ সৌভাগ্য অর্জনে শরীয়তের মৌলিক বিধানাবলি কীভাবে কাজ করে? (ما

المقصود بالسعادة في فلسفة الشاه ولي الله؟ وكيف تعمل الأحكام الشرعية الأساسية لتحقيق هذه السعادة؟)

২৮. "সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ" (জাতীয় নীতি)-এর আলোচনায় শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন? ( كيف حلل الشاه ولي الله الهيكل الأساسي للدولة الإسلامية في "مبحث السياسة الملية"؟)

২৯. "মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ" অধ্যায়ে শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনের (ইস্তিনবাতুশ শরাঈ) মূলনীতিগুলো কী কী? ( ما هي المبادئ الأساسية لـ "استنباط الشرائع" المذكورة في "مبحث السياسة الملية"؟)

৩০. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, নতুন মাসআলা বা পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনের জন্য মুজতাহিদগণ কোন পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবেন? ( ما هي المناهج التي يجب على المجتهدين اتباعها لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل أو الظروف الجديدة عند الشاه ولي الله؟)

৩১. "সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ"-এর আলোচনায় "ইরতিফাকাত" (সামাজিক সুবিধাদির ধারণাটি কী? এ ধারণা কীভাবে শরীয়ত প্রণয়নে ভূমিকা রাখে? ( ما هو مفهوم "الارتفاقات" في مناقشة السياسة الملية؟ وكيف يلعب هذا المفهوم دورا في سن الشريعة؟)

৩২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতির মূলনীতিগুলো শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন? ( كيف شرح الشاه ولي الله مبادئ الاقتصاد والسياسة الإسلامية على ضوء الشريعة؟)

৩৩. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ"-এ বর্ণিত বিধানাবলি উদ্ভাবনের নীতিগুলো সমসাময়িক ইসলামী ফিকহে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে- বিশ্লেষণ কর। ( كيف يمكن تطبيق مبادئ استنباط الشرائع المذكورة في "حجة الله البالغة" في الفقه الإسلامي المعاصر؟)

৩৪. "মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ" কেন এ কিতাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অংশ? এটি লেখকের সামগ্রিক দর্শনে কী স্থান অধিকার করে? ( لماذا يعد "مبحث السياسة الملية" جزءا مهما ومميزا من هذا الكتاب؟ وما هي مكانته في الفلسفة الشاملة للمؤلف؟)

৩৫. উম্মতের জীবনে সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহর প্রয়োজনীয়তা কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এর লক্ষ্য অর্জনে কী কী নির্দেশনা দিয়েছেন? ( ما هي ضرورة السياسة الملية في حياة الأمة؟ وما هي الإرشادات التي قدمها الشاه ولي الله لتحقيق أهدافها؟)

৩৬. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফিকহী ফুরু' (শাখা-মাসয়ালা)-তে ইখতিলাফের (মতপার্থক্য) কারণগুলো কী কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে এগুলো বিশ্লেষণ করেছেন? ( ما هي أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع الفقهية؟ وكيف حللها الشاه ولي الله؟)

৩৭. ইমামদের (ফুকাহাদের) মাযহাবগুলোর মধ্যে ইখতিলাফের মূল কারণগুলো কী? এ ইখতিলাফ কীভাবে উম্মতের জন্য রহমত হতে পারে? ( ما هي الأسباب الرئيسية لاختلاف مذاهب الفقهاء؟ وكيف يمكن لهذا الاختلاف أن يكون رحمة للأمة؟)

৩৮. "আহলুল হাদীস" ও "আহলুর রায়"-এর মধ্যকার পার্থক্যের মূল ভিত্তি কোথায়? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ দুই ধারার মধ্যকার ফারাক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? ( أين يكمن الأساس الرئيسي للفرق بين "أهل الحديث" و "أهل الرأي"؟ وكيف شرح الشاه ولي الله الفارق بين هذين التيارين؟)

৩৯. সাহাবীগণের ইজতিহাদের পদ্ধতি কেমন ছিল? তাদের ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও উম্মত কেন তাদের তাকলীদ (অনুসরণ) করবে? ( كيف كان منهج اجتهاد الصحابة؟ ولماذا تتبع الأمة تقليدهم بالرغم من اختلافهم؟)

৪০. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ফুকাহাদের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে "তাকলীদ" (অনুসরণ)-এর বিধান কী? কখন একজন সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জরুরি? ( ما هو حكم "التقليد" في حالة اختلاف الفقهاء عند الشاه ولي الله؟ ومتى يكون التقليد ضروريا للشخص العادي؟)

৪১. আহলুর রায় (হানাফি মাযহাব)-এর মুজতাহিদগণ কোন উসূলগুলোকে অধিক প্রাধান্য দিতেন? তাদের এ প্রাধান্যের কারণ কী ছিল? ( ما هي الأصول التي أولاها مجتهدو أهل الرأي (المذهب الحنفي) أهمية أكبر؟ وما هو سبب هذا الترجيح؟)

৪২. ইখতিলাফের এ আলোচনার মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামের উদারতা ও ফিকহী প্রশস্ততা তুলে ধরেছেন? ( كيف أبرز الشاه ولي الله سماحة الإسلام وسعته الفقهية من خلال هذه المناقشة حول الاختلاف؟)

৪৩. "আসবাবু ইখতিলাফিল মাযাহিব" অধ্যায়টি কিতাবের প্রধান উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) অর্জনে কী ভূমিকা রাখে? ( ما هو الدور الذي يلعبه باب "أسباب اختلاف المذاهب" في تحقيق المقاصد الرئيسية للكتاب؟)

৪৪. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে ইখতিলাফের কারণ হিসেবে "আল-ইতলাক ওয়াত-তাকয়ীদ" (নিরঙ্কুশতা ও সীমাবদ্ধতা)-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ( حلل دور "الإطلاق والتقييد" كسبب للاختلاف بين الصحابة والتابعين)

৪৫. চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম সমাজের সার্বিক অবস্থা কেমন ছিল? সে সময়ের ইলম চর্চা ও ফিকহী ধারা কেমন ছিল? ( كيف كان حال المجتمع المسلم قبل المائة الرابعة الهجرية؟ وكيف كان تداول العلم والتيار الفقهي في ذلك الوقت؟)

৪৬. চতুর্থ শতাব্দীর পরে মুসলিম সমাজের অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন এসেছিল? এ পরিবর্তন ইলম ও মাযহাবগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল? ( ما هي أنواع التغييرات التي طرأت على حال المجتمع المسلم بعد المائة الرابعة؟ وما هو تأثير هذا التغيير على العلم والمذاهب؟)

৪৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কেন এ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (চতুর্থ শতাব্দীর আগের ও পরের অবস্থা) কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন? এর উদ্দেশ্য কী ছিল? ( لماذا أدرج الشاه ولي الله هذا التحليل التاريخي (حول ما قبل وبعد المائة الرابعة) في الكتاب؟ وما هو الهدف منه؟)

৪৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, চতুর্থ শতাব্দীর পর ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে নতুন কী কী সমস্যা ও প্রবণতা দেখা গিয়েছিল? ( ما هي المشكلات والاتجاهات الجديدة التي ظهرت في علم الفقه والحديث بعد المائة الرابعة عند الشاه ولي الله؟)

৪৯. এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর যুগে (সমকালে) বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করতে চেয়েছিলেন? ( على ضوء

| |
|---|
| هذا الوصف التاريخي، كيف أراد الشاه ولي الله حل المشكلات القائمة في (عصره؟ |
| ৫০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে তাঁর যুগে তাকলীদ (অনুসরণ) এবং ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর ভারসাম্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন? ( كيف دعا الشاه ولي الله إلى الموازنة بين التقليد والاجتهاد في عصره؟) |
| ৫১. ইলমী অঙ্গনে "হিকায়াতু হাল আল-নাস" অধ্যায়টির গুরুত্ব কী? এটি কীভাবে উম্মতের মধ্যকার বিভাজন দূর করতে সাহায্য করে? ( ما هي أهمية باب "حكاية حال الناس" في الساحة العلمية؟ وكيف يساعد في إزالة الانقسامات بين الأمة؟) |
| ৫২. পবিত্রতা (তাহারাত) বিষয়ক শরয়ী বিধানাবলির "আসরার" (গোপন রহস্য) কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ ওযু ও গোসলের পেছনে থাকা মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? ( ما هي أسرار الأحكام الشرعية المتعلقة بـ "الطهامة"؟ وكيف شرح الشاه ولي الله المقاصد الأساسية وراء الوضوء والغسل؟) |
| ৫৩. সালাত (সালাত) বিধানের পেছন শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী কী আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য (আসরার) উদ্ঘাটন করেছেন? সালাত কীভাবে মানবাত্মার পরিতৃপ্তি ঘটায়? ( ما هي الأسرار الروحية والفلسفية التي كشف عنها الشاه ولي الله وراء حكم "الصلاة"؟ وكيف تطهر الصلاة النفس البشرية؟) |
| ৫৪. যাকাত (যাকাত) বিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রহস্য (আসরার) কী? এটি কীভাবে ধন-সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে? ( ما هي الأسرار الاقتصادية والاجتماعية لحكم "الزكاة"؟ وكيف تمنع تراكم الثروة؟) |
| ৫৫. সিয়াম (রোজা) বিধানের পেছনে শারীরিক ও আত্মিক কী কী রহস্য নিহিত রয়েছে? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ বিষয়ে কী ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন? ( ما هي الأسرار الجسدية والروحية الكامنة وراء حكم "الصوم"؟ وما هو نوع الشرح الذي قدمه الشاه ولي الله في هذا الصدد؟) |
| ৫৬. জীবিকার (মাঈশা) বিধানাবলি ও রিযিক তালাশ (ইবতিগাউর রিযক)-এর ক্ষেত্রে শরীয়তের রহস্য কী? কর্ম ও জীবিকা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা আলোচনা কর। ( ما هي أسرار الشريعة في أحكام "المعيشة" و "ابتغاء الرزق"؟ ناقش شرحه حول العمل والرزق) |

| |
|---|
| ৫৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে “বাব আসরার মা জা‘আ আনিন নাবী” (নবী থেকে আগত যাবতীয় জ্ঞানের রহস্য অধ্যায়ে) ইবাদতের ক্ষেত্রে “তাফাক্কুহ” (গভীর উপলব্ধি)-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন? ( كيف أبرز الشاه ولي الله ضرورة "التفقه" في العبادات في "باب أسرار ما جاء عن النبي (ص)"؟) |
| ৫৮. এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন ইবাদতের রহস্যগুলো কি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত? তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ( هل الأسرار المذكورة في هذا الباب للعبادات المختلفة مترابطة مع بعضها البعض؟ حلل العلاقة بينها) |
| ৫৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ইবাদতের এ “আসরার” বা গোপন রহস্য জানা একজন মুমিনের জীবনে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে? ( ما هو نوع التغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه معرفة هذه "الأسرار" في حياة المؤمن عند الشاه ولي الله؟) |
| ৬০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে শরীয়তের বাহ্যিক বিধান (জাহির) ও অন্তর্নিহিত রহস্যের (বাতিন) মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন? ( كيف حاول الشاه ولي الله التوفيق بين الحكم الظاهر للشريعة وأسرارها الباطنة؟) |

## ২৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, শরীয়তের বিধানাবলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়া) কী? এটি বিরর ও ইছম-এর ধারণাকে কীভাবে সমর্থন করে? (ما هي أهداف ومقاصد الشريعة عند الشاه ولي الله؟ وكيف تدعم هذه المقاصد مفهوم البر والإثم؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের কোনো বিধানই উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রতিটি হুকুমের পেছনে মহান আল্লাহর বিশেষ হিকমত বা প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে শরীয়তের এই উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদুশ শরীয়া'-কে অত্যন্ত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা।

**মাকাসিদুশ শরীয়ার সংজ্ঞা (تعريف مقاصد الشريعة):**

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মাকাসিদ' (مَقَاصِدُ) শব্দটি 'মাকসাদ' (مَقْصَدٌ)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা গন্তব্য। আর 'শরীয়াহ' অর্থ—জীবনব্যবস্থা বা পথ।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে মাকাসিদুশ শরীয়া হলো:

"تَحْقِيقُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ"

(দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ বা ক্ষতি দূর করা।)

শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ (المقاصد الأساسية):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) শরীয়তের উদ্দেশ্যকে প্রধানত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা 'জরুরিয়াতে খামসা' (পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়) নামে পরিচিত:

১. দ্বীন রক্ষা (حفظ الدين): ঈমান ও আকিদা সংরক্ষণ।

২. জান বা জীবন রক্ষা (حفظ النفس): মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা।

৩. আকল বা বুদ্ধি রক্ষা (حفظ العقل): মস্তিস্ক ও চিন্তাশক্তির সুরক্ষা।

৪. নসল বা বংশ রক্ষা (حفظ النسل): বংশধারা ও পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা।

৫. মাল বা সম্পদ রক্ষা (حفظ المال): বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন ও ভোগ।

বিরর ও ইছম-এর সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক (علاقة المقاصد بالبر والإثم):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, 'আল-বিরর' (পুণ্য) এবং 'আল-ইছম' (পাপ) ধারণা দুটি মাকাসিদুশ শরীয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাকাসিদ বাস্তবায়ন করাই হলো বিরর, আর মাকাসিদ ধ্বংস করাই হলো ইছম।

১. বিরর বা সৎকাজের সমর্থন:

যেসব কাজ শরীয়তের এই পাঁচটি উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করে, সেগুলোই হলো 'বিরর' বা সৎকাজ।

- **উদাহরণ:** নামাজ ও জিহাদ 'দ্বীন' রক্ষা করে, তাই এগুলো বিরর। বিবাহ 'বংশ' রক্ষা করে, তাই এটি বিরর। ব্যবসা-বাণিজ্য 'সম্পদ' রক্ষা করে, তাই হালাল উপার্জন বিরর।

২. ইছম বা পাপকাজের সমর্থন:

যেসব কাজ শরীয়তের এই পাঁচটি উদ্দেশ্যের ওপর আঘাত হানে বা ক্ষতি করে, সেগুলোই হলো 'ইছম' বা পাপ।

- **উদাহরণ:** কুফরি ও বিদআত 'দ্বীন' নষ্ট করে। হত্যা 'জীবন' নষ্ট করে। মদপান 'বুদ্ধি' নষ্ট করে। জিনা বা ব্যভিচার 'বংশ' নষ্ট করে। চুরি-ডাকাতি 'সম্পদ' নষ্ট করে। তাই এগুলো সবই ইছম বা কবিরা গুনাহ।

**পার্থক্য: মাকাসিদ ও সাধারণ নির্দেশের মধ্যে**

| বিষয় | মাকাসিদুশ শরীয়া (উদ্দেশ্য) | সাধারণ আহকাম (হুকুম) |
|---|---|---|
| **মূল লক্ষ্য** | মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও ফিতরাত রক্ষা। | নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন বা বর্জন। |
| **ব্যাপ্তি** | এটি ব্যাপক ও সর্বজনীন (কুল্লী)। | এটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ (জুযয়ী)। |

| | | |
|---|---|---|
| **সম্পর্ক** | এটি বিরর ও ইছমের কারণ বা ভিত্তি। | এটি বিরর ও ইছমের প্রকাশ। |

**ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):**

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তিনি মাসলাহাত বা মাকাসিদকে শরীয়তের দলিল হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।
- **হানাফি মাযহাব (শাহ ওয়ালী উল্লাহ):** হানাফি ফকীহগণ এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ 'মাসালিহে মুরসালা' বা জনকল্যাণকে শরীয়তের অন্যতম ভিত্তি মনে করেন। তাঁদের মতে, শরীয়তের হুকুমগুলো মাকাসিদের ওপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের বিধান কোনো যান্ত্রিক নিয়ম নয়। বরং এটি মানবাত্মার খোরাক। 'বিরর' বা পুণ্যকাজ মানুষকে মাকাসিদের দিকে নিয়ে যায়, যা তাকে সৌভাগ্যবান করে। আর 'ইছম' বা পাপকাজ মাকাসিদ নষ্ট করে মানুষকে দুর্ভাগা করে।

---

## ২৬. "আল-বিরর" অর্জনের ক্ষেত্রে "ইহসান" (উত্তম আচরণ)-এর ভূমিকা কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে মানব আচরণের সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা করেছেন?

**(ما هو دور الإحسان في تحقيق " البر " ؟ وكيف شرح الشاه ولي الله دقة السلوك البشري؟)**

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তে 'আল-বিরর' বা পুণ্যের সর্বোচ্চ স্তর হলো 'ইহসান'। এটি কেবল বাহ্যিক আমল নয়, বরং অন্তরের গভীর অবস্থা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে ইহসানকে বিরর অর্জনের প্রাণশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

**ইহসানের সংজ্ঞা (تعريف الإحسان):**

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইহসান' (إِحْسَانٌ) শব্দটি 'হাসুনা' (حَسُنَ) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা, উত্তম আচরণ করা, অনুগ্রহ করা।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হাদিসে জিবরীলে রাসূল (সা.) ইহসানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ সেটিকেই ভিত্তি ধরেছেন:

"أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"

(তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তাঁকে দেখছ। আর যদি তাঁকে না দেখ, তবে (বিশ্বাস রাখ যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।)

**বিরর অর্জনে ইহসানের ভূমিকা (دور الإحسان):**

১. আমলের রুহ বা প্রাণ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, সাধারণ 'বিরর' বা নেক আমল হলো দেহের মতো, আর 'ইহসান' হলো তার প্রাণ। ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ছাড়া যেমন আমল কবুল হয় না, তেমনি ইহসান ছাড়া বিরর পূর্ণতা পায় না। ইহসান মানুষের আমলকে লৌকিকতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর জন্য খাস করে দেয়।

২. আল্লাহর মোরাকাবা (ধ্যান):

ইহসানের মাধ্যমে বান্দার অন্তরে সর্বক্ষণ আল্লাহর উপস্থিতি বা 'মোরাকাবা'র অনুভূতি জাগে। ফলে সে গোপনেও পাপ কাজ (ইছম) থেকে বিরত থাকে এবং নেক কাজে অগ্রগামী হয়।

৩. সৃষ্টির সেবা:

ইহসান কেবল ইবাদতে নয়, বরং সৃষ্টির সেবায়ও প্রতিফলিত হয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন—সবই ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম।

মানব আচরণের সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা (دقة السلوك البشري):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মানব আচরণের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের আচরণ তিন স্তরে বিভক্ত:

১. **ইসলাম:** বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্য।

২. **ঈমান:** অন্তরের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি।

৩. **ইহসান:** অন্তরের গভীর অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ।

তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ যখন ইহসানের স্তরে পৌঁছায়, তখন তার নফস বা প্রবৃত্তি শান্ত হয়ে যায় **(নফসে মুতমাইন্না)**। তখন সে কষ্টের কাজকেও আনন্দের সাথে গ্রহণ করে এবং পাপ কাজকে ঘৃণা করে।

**উদাহরণ (مثال):**

- **নামাজ:** সাধারণ বিরর হলো নামাজের রুকন-শর্ত আদায় করা। আর ইহসান হলো খুশু-খুজু বা বিনয়ের সাথে এমনভাবে নামাজ পড়া যেন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা হচ্ছে।
- **দান-সদকা:** সাধারণ বিরর হলো গরিবকে সাহায্য করা। আর ইহসান হলো গোপনে দান করা এবং দান করে খোঁটা না দেওয়া।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, 'ইহসান' হলো মুমিনের মেরাজ। এটি মানুষকে সাধারণ পুণ্যবান থেকে 'মুহসিন' বা আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। ইহসান ছাড়া 'আল-বিরর' বা পুণ্যকাজ কেবল একটি নিষ্প্রাণ কাঠামো মাত্র।

---

## ২৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে সৌভাগ্য (সাআদাহ) বলতে কী বোঝায়? এ সৌভাগ্য অর্জনে শরীয়তের মৌলিক বিধানাবলি কীভাবে কাজ করে?

## (ما المقصود بالسعادة في فلسفة الشاه ولي الله؟ وكيف تعمل الأحكام الشرعية الأساسية لتحقيق هذه السعادة؟)

ভূমিকা:

মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? গ্রিক দার্শনিকরা একে 'সুখ' বলেছেন, কিন্তু ইসলাম একে 'সাআদাহ' বা সৌভাগ্য বলে অভিহিত করেছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) সাআদাহর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা ইসলামি দর্শনের এক অমূল্য

সম্পদ। তাঁর মতে, সাআদাহ হলো পাশবিকতা দমন করে ফেরেশতাসুলভ গুণ অর্জন করা।

সাআদাহর পরিচয় (تعريف السعادة):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করে:

১. **আল-বাহিমিয়্যাহ (البهيمية):** পাশবিক শক্তি (খাদ্য, নিদ্রা, যৌনতা)।

২. **আল-মালাকিয়্যাহ (الملكية):** ফেরেশতাসুলভ শক্তি (পবিত্রতা, আল্লাহর জিকির)।

**'সাআদাহ'** হলো সেই অবস্থা, যখন মানুষের ফেরেশতাসুলভ শক্তি তার পাশবিক শক্তির ওপর বিজয়ী হয়। তখন মানুষের আত্মা উর্ধ্বজগৎ বা 'আলমে মালাকুত'-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

সাআদাহ অর্জনে শরীয়তের মৌলিক বিধানের ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, শরীয়তের সমস্ত ইবাদত মূলত মানুষকে চারটি মৌলিক গুণ বা 'আখলাকে আরবা'আ' অর্জনে সাহায্য করে, যা সাআদাহর চাবিকাঠি:

**১. তাহারাত (পবিত্রতা) অর্জন:**

- **বিধান:** ওযু, গোসল, নাপাকি থেকে বেঁচে থাকা।
- **ভূমিকা:** এর মাধ্যমে মানুষের ভেতর ও বাহির পরিষ্কার হয়। পাশবিক অন্ধকার দূর হয়ে অন্তরে নূর পয়দা হয়। পবিত্রতা মানুষকে ফেরেশতাদের সাদৃশ্য দান করে।

**২. ইখবাত (বিনয়) অর্জন:**

- **বিধান:** নামাজ, জিকির, দোয়া, তিলাওয়াত।
- **ভূমিকা:** নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর মহত্ত্বের সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করে। রুকু-সিজদা মানুষের অহংকার চূর্ণ করে বিনয়ী করে তোলে। এই বিনয়ই তাকে আল্লাহর প্রিয় করে।

**৩. সামাহাত (উদারতা) অর্জন:**

- **বিধান:** যাকাত, সদকা, কুরবানি, দান-খয়রাত।
- **ভূমিকা:** মানুষের অন্তরে সম্পদের লোভ ও কৃপণতা থাকে, যা তাকে পশুত্বের দিকে টানে। যাকাত ও দানের মাধ্যমে এই লোভ দূর হয় এবং অন্তরে উদারতা বা 'সামাহাত' তৈরি হয়। এটি মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে।

**৪. আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) অর্জন:**

- **বিধান:** রোজা, হজ, মু'আমালাত (লেনদেন), হুদুদ (শাস্তি)।
- **ভূমিকা:** রোজা মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ইনসাফ শেখায়। মু'আমালাতের বিধান সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আদালাত মানুষকে জুলুম থেকে বিরত রাখে।

**ছক: বিধান ও সাআদাহর সম্পর্ক**

| মৌলিক গুণ (সাআদাহর সোপান) | সহায়ক শরয়ী বিধান | ফলাফল |
|---|---|---|
| **তাহারাত** (পবিত্রতা) | ওযু, গোসল | অন্তরের নূর ও ফেরেশতাদের সাদৃশ্য। |
| **ইখবাত** (বিনয়) | নামাজ, জিকির | আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ ও অহংকার বিনাশ। |
| **সামাহাত** (উদারতা) | যাকাত, সদকা | সম্পদের মোহ ত্যাগ ও আত্মার প্রশান্তি। |
| **আদালাত** (ন্যায়বিচার) | রোজা, মু'আমালাত | প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক শৃঙ্খলা। |

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে, শরীয়তের বিধানগুলো কোনো বোঝা নয়, বরং এগুলো হলো 'সাআদাহ' বা সৌভাগ্যের পথে চলার পাথেয়। এই বিধানগুলো মেনে চললেই মানুষ 'ইনসানে কামিল' বা পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং পরকালীন অসীম সুখ লাভ করতে পারে।

## ২৮. "সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ" (জাতীয় নীতি)-এর আলোচনায় শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন?

## (كيف حلل الشاه ولي الله الهيكل الاساسي للدولة الإسلامية في " مبحث السياسة الملية " ؟)

ভূমিকা:

ইসলাম কেবল মসজিদকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, বরং এটি একটি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' (জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নীতি) অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র, কাঠামো এবং পরিচালনার নীতি নিয়ে এক অসাধারণ দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহর সংজ্ঞা (تعريف السياسة الملية):

'সিয়াসাত' অর্থ রাজনীতি বা পরিচালনা, আর 'মিল্লাত' অর্থ জাতি বা ধর্ম। পারিভাষিক অর্থে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করার নীতিকে 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' বলা হয়। এটি শাহ ওয়ালী উল্লাহর সমাজতাত্ত্বিক দর্শন 'ইরতিফাকাত'-এর সর্বোচ্চ স্তর।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো (الهيكل الأساسي للدولة):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইসলামি রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত দেহের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের কাঠামোকে কয়েকটি অপরিহার্য অঙ্গ বা স্তম্ভে ভাগ করেছেন:

১. ইমাম বা খলিফা (রাষ্ট্রপ্রধান):

তিনি রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য একজন আমীর বা খলিফা থাকা ফরজ।

- **দায়িত্ব:** দ্বীনের হেফাজত করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, জিহাদ পরিচালনা করা এবং মাজলুমের অধিকার আদায় করা।
- **যোগ্যতা:** তাঁকে অবশ্যই জ্ঞান (ইলম), সাহস (শুজায়াত) এবং ন্যায়পরায়ণতার (আদালাত) অধিকারী হতে হবে।

২. বিচার বিভাগ (আল-কাজা):

রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হলো বিচার বিভাগ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বিচারককে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

- **কাজঃ** মানুষের বিবাদ মীমাংসা করা, হুদুদ (শাস্তি) কার্যকর করা এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা।

৩. নির্বাহী ও সামরিক বাহিনী (আল-জাইশ ওয়াল হুকুমাত):

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী অপরিহার্য।

- **কাজঃ** বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা (জিহাদ) এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, সৈনিকদের অবশ্যই দ্বীনি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

৪. অর্থনৈতিক কাঠামো (বায়তুল মাল):

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। যাকাত, উশর, জিজিয়া এবং খরাজ আদায়ের মাধ্যমে 'বায়তুল মাল' বা সরকারি কোষাগার গঠন করতে হবে।

- **নীতিঃ** সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়। জনকল্যাণে এই সম্পদ ব্যয় করতে হবে।

৫. শুরা বা পরামর্শ সভা:

খলিফা একনায়কতান্ত্রিক হবেন না। তিনি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (বিশিষ্ট জ্ঞানী ও নীতিনির্ধারক)-দের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। কুরআনের নির্দেশ—"ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম" (তাদের কাজ সম্পন্ন হয় পারস্পরিক পরামর্শে)।

নগর ও সমাজ ব্যবস্থাপনা (ইরতিফাকাত):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাষ্ট্রের কাঠামোতে নগর জীবনের (তৃতীয় ইরতিফাক) গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রকে অবশ্যই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, ইসলামি রাষ্ট্র কোনো নিছক শাসনযন্ত্র নয়। এটি হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' অধ্যায়ে তিনি এমন এক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রূপরেখা দিয়েছেন, যা ন্যায়বিচার, মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

## ২৯. "মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ" অধ্যায়ে শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনের (ইস্তিনবাতুশ শরাঈ) মূলনীতিগুলো কী কী?

## (ما هي المبادئ الأساسية لـ " استنباط الشرائع " المذكورة في " مبحث السياسة الملية " ؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ' (مَبَاحِثُ السِّيَاسَةِ الْمِلِّيَّةِ)। এই অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্য শরীয়ত বা আইন পাঠান, তখন সেখানে কী কী মূলনীতি বা 'উসূল' অনুসরণ করা হয়। এই মূলনীতিগুলো জানলে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন বা 'ইস্তিনবাত' সহজ হয়।

ইস্তিনবাতুশ শরাঈ-এর সংজ্ঞা (تعريف استنباط الشرائع):

'ইস্তিনবাত' অর্থ গভীর গবেষণার মাধ্যমে কোনো কিছু বের করা। আর 'ইস্তিনবাতুশ শরাঈ' বলতে বোঝায়—যুগ ও জাতির অবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণকর আইন বা বিধান প্রণয়ন করার পদ্ধতি।

বিধান উদ্ভাবনের মূলনীতিসমূহ (المبادئ الأساسية للاستنباط):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই অধ্যায়ে বিধান উদ্ভাবনের জন্য তিনটি প্রধান মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন:

১. সহজীকরণ ও কাঠিন্য দূরীকরণ (আত-তাইসীর ওয়া রাফ'উল হারাজ):

শরীয়তের বিধান দেওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাব ও ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখেন। কোনো অসম্ভব বা অসহনীয় বিধান মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

- **মূলনীতি:** বিধান হতে হবে সহজ ও পালনযোগ্য।
- **আরবি ইবারত:** আল্লাহ বলেন, "**يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**" (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না)।
- **উদাহরণ:** সফরে চার রাকাত নামাজকে দুই রাকাত (কসর) করা এবং অসুস্থ অবস্থায় বসে নামাজ পড়ার অনুমতি।

২. প্রচলিত প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখা (রি'আয়াতুল উরফ):

বিধান উদ্ভাবনের সময় সেই জাতির মধ্যে প্রচলিত ভালো অভ্যাস বা 'উফ' (العرف)-কে শরীয়ত স্বীকৃতি দেয়। একেবারে অপরিচিত কোনো নিয়ম চাপিয়ে দিলে মানুষ তা মানতে চাইবে না।

- **মূলনীতি:** জাতির অভ্যস্ত রীতিনীতিকে সংশোধন করে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা, যদি তা ক্ষতিকর না হয়।
- **উদাহরণ:** আরবদের মধ্যে 'দিয়াত' (রক্তপণ) উটের মাধ্যমে দেওয়ার প্রথা ছিল। ইসলাম সেটাকেই বহাল রেখেছে।

৩. বিকৃত প্রথা উচ্ছেদ ও সংশোধন (ইজালাতুল ফাসাদ):

সমাজে প্রচলিত যেসব প্রথা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা শিরক-বিদআত মিশ্রিত, সেগুলোকে উচ্ছেদ করা বা সংশোধন করা বিধান উদ্ভাবনের অন্যতম লক্ষ্য।

- **মূলনীতি:** মন্দের মূলোৎপাটন এবং ভালোর সংস্থাপন।
- **উদাহরণ:** জাহেলি যুগেও হজ ও বিয়ে ছিল, কিন্তু তাতে অশ্লীলতা ও শিরক ছিল। ইসলাম মূল কাঠামো ঠিক রেখে অশ্লীলতা দূর করেছে।

৪. সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসা (তানায্যুল):

শরীয়তের বিধান এমন হতে হবে যা সমাজের সর্বোচ্চ জ্ঞানী থেকে শুরু করে সাধারণ রাখাল পর্যন্ত সবাই বুঝতে ও মানতে পারে। এটি খুব বেশি তাত্ত্বিক বা জটিল হওয়া যাবে না।

- **শাহ ওয়ালী উল্লাহর ব্যাখ্যা:** তিনি বলেন, নবীরা হলেন **'হাকিম'** বা চিকিৎসক। তাঁরা রোগীর (উম্মতের) অবস্থা বুঝে ওষুধের (শরীয়তের) মাত্রা নির্ধারণ করেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের বিধানগুলো কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়। বরং এগুলো মানুষের সাধ্য, অভ্যাস এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই 'ইস্তিনবাত' বা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই মূলনীতিগুলো মুজতাহিদদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

---

## ৩০. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, নতুন মাসআলা বা পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনের জন্য মুজতাহিদগণ কোন পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবেন? (ما هي المناهج التي يجب على المجتهدين اتباعها لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل أو الظروف الجديدة عند الشاه ولي الله؟)

ভূমিকা:

যুগ পরিবর্তনশীল এবং মানুষের সমস্যাও নিত্যনতুন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, নস (কুরআন-সুন্নাহর টেক্সট) সীমিত, কিন্তু সমস্যা অসীম। তাই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে তিনি নতুন পরিস্থিতিতে (Nawazil) মুজতাহিদগণের বিধান উদ্ভাবনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন।

### নতুন মাসআলায় মুজতাহিদগণের অনুসরণীয় পদ্ধতি (مناهج المجتهدين):

১. মাকাসিদুশ শরীয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, নতুন কোনো সমস্যা আসলে মুজতাহিদকে দেখতে হবে—শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদ' (দ্বীন, জান, মাল, আকল, নসল

রক্ষা) কী? যে সমাধানটি এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করবে, সেটিই হবে শরীয়তের বিধান।

- **উদাহরণ:** আধুনিক মাদক (যেমন ইয়াবা) কুরআনে নেই। কিন্তু যেহেতু এটি 'আকল' বা বুদ্ধি নষ্ট করে (মাকাসিদ বিরোধী), তাই মুজতাহিদ একে হারাম বলবেন।

২. তাখরীজ ও কিয়াস (التخريج والقياس):

যদি সরাসরি নস না পাওয়া যায়, তবে মুজতাহিদকে পূর্ববর্তী ইমামদের উসূল বা মূলনীতির আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। একে 'তাখরীজ' বলা হয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ হানাফি উসূলের আলোকে এই পদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছেন।

- **পদ্ধতি:** নতুন সমস্যাটিকে পুরনো কোনো সমাধানকৃত সমস্যার (আসল) সাথে তুলনা (কিয়াস) করা, যদি উভয়ের কারণ (ইল্লত) এক হয়।

৩. মাসালিহে মুরসালা (জনকল্যাণ) বিবেচনা:

যদি কিয়াসও করা না যায়, তবে মুজতাহিদ দেখবেন কোন ফয়সালায় মানুষের কল্যাণ (মাসলাহাত) বেশি এবং ক্ষতি (মাফাসাদ) কম। শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, "দ্বীনের ভিত্তি হলো মাসলাহাত বা কল্যাণ।"

- **উদাহরণ:** ট্রাফিক আইন মানা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব, কারণ এতে মানুষের জান-মাল রক্ষা পায় (মাসলাহাত), যদিও হাদিসে ট্রাফিক লাইটের কথা নেই।

৪. যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় (তাতবীক):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, মুজতাহিদকে অবশ্যই তাঁর যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যুগের পরিবর্তন হলে ফতোয়াও পরিবর্তিত হতে পারে, যদি তা মূলনীতির বিরোধী না হয়।

- **ইবারত:** "**اخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ**" (যুগের পরিবর্তনের সাথে বিধানের পরিবর্তন)।

৫. ইনসাফ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন:

তিনি মুজতাহিদদের বাড়াবাড়ি (ইফরাত) ও ছাড়াছাড়ি (তাফরিত) ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহার করে দলিলের ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ইনসাফপূর্ণ মতটি গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর নির্দেশিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইসলামী আইন কখনোই স্থবির হবে না। বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল নতুন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবে। তিনি মুজতাহিদকে 'সময়ের চিকিৎসক' হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

---

## ৩১. "সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ"-এর আলোচনায় "ইরতিফাকাত" (সামাজিক সুবিধাদি)-এর ধারণাটি কী? এ ধারণা কীভাবে শরীয়ত প্রণয়নে ভূমিকা রাখে? (ما هو مفهوم " الارتفاقات " في مناقشة السياسة الملية؟ وكيف يلعب هذا المفهوم دورا في سن الشريعة؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো 'ইরতিফাকাত' (الِارْتِفَاقَاتُ) তত্ত্ব। 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' বা জাতীয় রাজনীতির আলোচনায় তিনি এই তত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়ত এবং সমাজব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক।

ইরতিফাকাত-এর ধারণা (مفهوم الارتفاقات):

'ইরতিফাক' অর্থ হলো—উপকার লাভ করা, সহযোগিতা নেওয়া বা অবলম্বন করা। পরিভাষায়, মানুষের জীবনধারণ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ 'ইরতিফাকাত' বলেছেন। মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য ধাপে ধাপে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাই ইরতিফাকাত।

এটি চারটি স্তরে বিভক্ত:

১. **প্রথম ইরতিফাক:** বন্য বা গ্রামীণ জীবন (ভাষা, কৃষি ও পোশাক আবিষ্কার)।

২. **দ্বিতীয় ইরতিফাক:** পারিবারিক ও সামাজিক জীবন (লেনদেন, বিয়ে, আদব-কায়দা)।

৩. **তৃতীয় ইরতিফাক:** নগর ও রাষ্ট্রীয় জীবন (প্রশাসন, বিচার, রাজনীতি)।

৪. **চতুর্থ ইরতিফাক:** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (খিলাফত বা বিশ্ব নেতৃত্ব)।

**শরীয়ত প্রণয়নে ইরতিফাকাতের ভূমিকা (دور الارتفاقات في الشريعة):**

১. দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইরতিফাকের সংরক্ষণ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূল পাঠান মূলত মানুষের 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইরতিফাক' বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য।

- মানুষ যখন সমাজে বাস করে, তখন লোভ-লালসার কারণে ঝগড়া বাধে। শরীয়ত এসে সেই ঝগড়া মেটানোর জন্য আইন (যেমন—চুরির শাস্তি, বিবাহের নিয়ম) দেয়। অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানগুলো ইরতিফাকাতকে রক্ষা করার জন্যই প্রণীত হয়েছে।

২. বিধানের যৌক্তিকতা প্রমাণ:

ইরতিফাকাত তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায় যে, শরীয়তের বিধানগুলো মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজনেরই প্রতিফলন।

- **উদাহরণ:** 'জিনা' বা ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে কেন? কারণ এটি 'দ্বিতীয় ইরতিফাক' অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। 'চুরি' হারাম কেন? কারণ এটি মানুষের সম্পদ অর্জনের নিরাপত্তাকে নষ্ট করে।

৩. সমাজের স্তরের ওপর বিধানের নির্ভরতা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, কোনো সমাজ কোন ইরতিফাকে আছে, তার ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের কঠোরতা বা নমনীয়তা নির্ভর করে।

- বেদুইন সমাজের জন্য যে শরীয়ত (সহজ নিয়ম), উন্নত নগর সভ্যতার জন্য শরীয়তের নিয়ম তার চেয়ে বিস্তারিত হতে পারে। ইসলাম সব স্তরের ইরতিফাকাতের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো বিধান দিয়েছে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, শরীয়ত আকাশ থেকে পড়া কোনো বিচ্ছিন্ন আইন নয়। বরং এটি 'ইরতিফাকাত' বা মানব সভ্যতার সুস্থ বিকাশের একমাত্র গ্যারান্টি। ইরতিফাকাত হলো দেহ, আর শরীয়ত হলো তার প্রাণ।

---

## ৩২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতির মূলনীতিগুলো শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন?

## (كيف شرح الشاه ولي الله مبادئ الاقتصاد والسياسة الإسلامية على ضوء الشريعة؟)

ভূমিকা:

ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে ইবাদতের পাশাপাশি অর্থনীতি (ইকতিসাদ) এবং রাজনীতি (সিয়াসাত) নিয়েও গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ছাড়া 'সাআদাহ' বা সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব নয়।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি (مبادئ الاقتصاد الإسلامي):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আদালাত' (ন্যায়বিচার) এবং 'তা'আউন' (সহযোগিতা)-কে ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন।

১. সম্পদের সুষম বণ্টন:

তিনি বলেন, সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না হয় (যেমন কুরআনে বলা হয়েছে)। যাকাত ও মিরাসের বিধানের মাধ্যমে সম্পদ সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্য।

২. শোষণমুক্ত সমাজ (ফাক্কু কুল্লি নিযাম):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "যে সমাজব্যবস্থা মানুষকে পশুর মতো খাটিয়ে মারে এবং রুহানি উন্নতির সুযোগ দেয় না, তা ধ্বংস করা ওয়াজিব।" তিনি কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর এবং শ্রমিক শোষণকে হারাম বলেছেন।

৩. অপব্যয় ও বিলাসিতা রোধ:

তিনি 'ইসরাফ' (অপব্যয়) এবং 'ইতরাফ' (বিলাসিতা)-কে অর্থনীতির জন্য ক্যান্সার মনে করেন। কারণ বিলাসিতা মানুষকে লোভী করে এবং সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে।

৪. ক্ষতিকর লেনদেন নিষিদ্ধকরণ:

সুদ, জুয়া, ধোঁকাবাজি এবং মজুতদারি (ইহতিকার) হারাম হওয়ার কারণ হলো—এগুলো মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা (দ্বিতীয় ইরতিফাক) নষ্ট করে দেয় এবং শত্রুতা সৃষ্টি করে।

ইসলামী রাজনীতির মূলনীতি (مبادئ السياسة الإسلامية):

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি 'খিলাফত' এবং 'মিল্লাত'-এর ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা:

তিনি বলেন, দ্বীন রক্ষা এবং দুনিয়া পরিচালনার জন্য একজন খলিফা বা ইমাম থাকা অপরিহার্য। ইমামের কাজ হলো—নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২. শুরা বা পরামর্শ:

রাষ্ট্রপ্রধান একনায়ক হবেন না। তিনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ (শুরা) করে রাষ্ট্র চালাবেন। এটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।

৩. জিহাদ ও নিরাপত্তা:

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ফিতনা দমনের জন্য জিহাদ বা সামরিক শক্তি অপরিহার্য। তবে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো—"ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ" (আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তোলা) এবং জুলুমের অবসান ঘটানো, রাজ্য দখল করা নয়।

৪. ন্যায়বিচার (আদালাত):

শাসকের প্রধান গুণ হতে হবে ন্যায়পরায়ণতা। প্রজা সাধারণের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দেওয়া শাসকের ঈমানি দায়িত্ব।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতি কোনো ক্ষমতার খেলা নয়। বরং এটি হলো মানুষকে দারিদ্র্য ও জুলুম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যম। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন—"রুটি-রুজি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব"—আজকের যুগেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

---

## ৩৩. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ"-এ বর্ণিত বিধানাবলি উদ্ভাবনের নীতিগুলো সমসাময়িক ইসলামী ফিকহে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে- বিশ্লেষণ কর। (كيف يمكن تطبيق مبادئ استنباط الشرائع المذكورة في " حجة الله البالغة " في الفقه الإسلامي المعاصر؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর কালজয়ী গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কেবল একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং এটি সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের এক জীবন্ত নির্দেশিকা। আধুনিক যুগে উদ্ভূত জটিল সমস্যাবলির (নাওয়াজিল) সমাধানে এই কিতাবে বর্ণিত বিধান উদ্ভাবনের নীতিগুলো বা 'মাবাদিই ইস্তিনবাতিশ শারাঈ' (مَبَادِئُ اسْتِنْبَاطِ الشَّرَائِعِ) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

**সমসাময়িক ফিকহে প্রয়োগ পদ্ধতি (طريقة التطبيق في الفقه المعاصر):**

১. মাকাসিদুশ শরীয়ার ভিত্তিতে সমাধান:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনের মূল কথাই হলো—শরীয়তের প্রতিটি বিধান জনকল্যাণ বা 'মাসলাহাত' নিশ্চিত করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (যেমন—অঙ্গ প্রতিস্থাপন, টেস্ট টিউব বেবি) বা অর্থনীতি (শেয়ার বাজার, ডিজিটাল কারেন্সি)-এর ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ এই নীতি প্রয়োগ করতে পারেন।

- **প্রয়োগ:** যদি কোনো নতুন পদ্ধতি মানুষের 'জান' বা 'মাল' রক্ষা করে এবং শরীয়তের মৌলিক কোনো নসের বিরোধী না হয়, তবে 'মাসলাহাত'-এর ভিত্তিতে তা জায়েজ বলা যেতে পারে।

- **আরবি ইবারত:** "**بِنَاءُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْمَصَالِحِ**" (কল্যাণের ওপর বিধানের ভিত্তি স্থাপন)।

২. যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় (তাতবীক):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, নবীগণ তাঁদের যুগের মানুষের অভ্যাস ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিধান দিয়েছেন। আধুনিক ফিকহেও এই নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

- **প্রয়োগ:** বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুরনো কিছু কঠোর নীতি শিথিল করা যেতে পারে, যদি তা ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

- **মূলনীতি:** "**تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ**" (যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তন হতে পারে)।

৩. ইরতিফাকাত তত্ত্বের ব্যবহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'ইরতিফাকাত' (সামাজিক বিবর্তন) তত্ত্ব আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগযোগ্য।

- **প্রয়োগ:** আধুনিক নগরায়ন, ট্রাফিক আইন, পরিবেশ রক্ষা আইন— এগুলো সবই 'তৃতীয় ও চতুর্থ ইরতিফাক'-এর অংশ। শরীয়তে এগুলোর সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও, সামাজিক শৃঙ্খলার স্বার্থে এগুলো মেনে চলা ওয়াজিব ফতোয়া দেওয়া যায়।

৪. সহজীকরণ নীতি (আত-তাইসীর):

আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষ নানা ব্যস্ততায় জর্জরিত। শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'সামাহাত' (উদারতা) নীতি প্রয়োগ করে ইবাদত ও মু'আমালাতে মানুষকে সহজ সমাধান দেওয়া যেতে পারে।

- **প্রয়োগ:** সফরের দূরত্ব, নামাজের সময় এবং জাকাত আদায়ের পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

উপসংহার:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'র নীতিগুলো আধুনিক ফিকহকে স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন কোনো বদ্ধ জলাশয় নয়, বরং এটি একটি প্রবহমান নদী যা সব যুগের মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম। মুজতাহিদগণ এই কিতাবকে গাইডলাইন হিসেবে গ্রহণ করলে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে।

---

## ৩৪. "মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ" কেন এ কিতাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অংশ? এটি লেখকের সামগ্রিক দর্শনে কী স্থান অধিকার করে?

## (لماذا يعد " مبحث السياسة الملية " جزءا مهما ومميزا من هذا الكتاب؟ وما هي مكانته في الفلسفة الشاملة للمؤلف؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর দর্শন কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের 'মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ' (জাতীয় বা মিল্লাত পরিচালনা নীতি) অধ্যায়টি ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের এক অনন্য দলিল। এটি কিতাবের এমন এক অংশ যা লেখককে একজন ফকীহ থেকে একজন বিশ্বমানের সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রদার্শনিকে উন্নীত করেছে।

**গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অংশ হওয়ার কারণ:**

১. ইরতিফাকাতের পূর্ণতা:

লেখক মানব সভ্যতার বিকাশকে চারটি স্তরে (ইরতিফাকাত) ভাগ করেছেন। এই অধ্যায়টি হলো সেই ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত রূপ। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে একটি সমাজ 'মিল্লাত' বা জাতিতে পরিণত হয় এবং কীভাবে তাকে পরিচালনা করতে হয়। এটি ছাড়া তাঁর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা অসম্পূর্ণ।

২. শরীয়ত ও রাজনীতির সংযোগ:

সাধারণত ফিকহের কিতাবে রাজনীতিকে আলাদা বিষয় ভাবা হয়। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই অধ্যায়ে প্রমাণ করেছেন যে, রাজনীতি (সিয়াসাত) শরীয়তেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি দেখিয়েছেন, নবীদের আগমন কেবল নামাজ শেখানোর জন্য নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার সঠিক নীতি শেখানোর জন্যও হয়েছে।

৩. সর্বজনীনতা:

এই অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিগুলো কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং যেকোনো কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য। ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সমতা এবং নিরাপত্তার যে রূপরেখা তিনি দিয়েছেন, তা সর্বজনীন।

**লেখকের সামগ্রিক দর্শনে এর স্থান (المكانة في الفلسفة الشاملة):**

ক. সাআদাহ বা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের 'সাআদাহ' (সৌভাগ্য) নিশ্চিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি দুর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ না হয়, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ইবাদত করে সৌভাগ্য লাভ করা কঠিন। তাই 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' হলো আখেরাতের মুক্তির জাগতিক ভিত্তি।

খ. খিলাফতের সঠিক ব্যাখ্যা:

তিনি খিলাফতকে কেবল একটি শাসন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেননি, বরং একে 'খিলাফাতুন নুবুওয়াহ' বা নবীর কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর দর্শনে, রাজনীতি হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

উপসংহার:

'মাবাহিসুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়াহ' অধ্যায়টি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবের মুকুটমণি। এটি লেখকের এই দর্শনেরই প্রতিফলন যে—"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মসজিদ থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।"

---

## ৩৫. উম্মতের জীবনে সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহর প্রয়োজনীয়তা কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এর লক্ষ্য অর্জনে কী কী নির্দেশনা দিয়েছেন?

## (ما هي ضرورة السياسة الملية في حياة الأمة؟ وما هي الإرشادات التي قدمها الشاه ولي الله لتحقيق أهدافها؟)

ভূমিকা:

মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ জীব (মাদানিয়্যুন বিত-তাব')। কিন্তু মানুষের মধ্যে লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতাও বিদ্যমান। তাই সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা

করার জন্য এবং উম্মতের ঐক্য ধরে রাখার জন্য 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' বা জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন।

## উম্মতের জীবনে প্রয়োজনীয়তা (الضرورة في حياة الأمة):

১. দ্বীন ও দুনিয়ার সংরক্ষণ:

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেছেন, "দ্বীন ও রাষ্ট্র যমজ ভাই।" শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ ছাড়া দ্বীনের বিধান (যেমন—হুদুদ, জিহাদ, জুমা) কায়েম করা অসম্ভব। এটি মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়।

২. জুলুম প্রতিরোধ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা:

শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকলে সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবে। 'মাতসান্যায়' বা অরাজকতা রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তির (ইমামত) প্রয়োজন, যা ইনসাফ কায়েম করবে।

৩. ইরতিফাকাতের বিকাশ:

সভ্যতার উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার দরকার। সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রনীতি ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন (ইরতিফাকাত) সম্ভব নয়।

## লক্ষ্য অর্জনে শাহ ওয়ালী উল্লাহর নির্দেশনাবলী (الإرشادات):

১. ইমাম বা খলিফা নিয়োগ:

তিনি বলেন, উম্মতের প্রথম কাজ হলো একজন যোগ্য, জ্ঞানবান ও সাহসী ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা। নেতার আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ তিনি শরীয়ত মেনে চলেন।

- **হাদিস: "যে ব্যক্তি ইমাম ছাড়া মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।"**

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:
রাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বাধীন কাজি বা বিচারক নিয়োগ দিতে হবে, যারা নির্ভয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করবেন। বিচারক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি করা যাবে না।

৩. জিহাদ ও প্রতিরক্ষা:

বহিঃশত্রুর হাত থেকে মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি ও জিহাদ ফরজ। তবে জিহাদ হতে হবে আল্লাহর রাস্তায়, রাজ্য দখলের জন্য নয়।

৪. হুদুদ বা শাস্তির বিধান কার্যকর:

সমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য চোর, জিনাকার ও ডাকাতদের ওপর শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ) প্রয়োগ করতে হবে। এতে দয়া দেখানো যাবে না।

৫. শুরা ভিত্তিক পরিচালনা:

একনায়কতন্ত্র পরিহার করে আলেম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে (শুরা) রাষ্ট্র চালাতে হবে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ কোনো ক্ষমতার ভোগ-বিলাস নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। তাঁর নির্দেশনাগুলো মেনে চললে উম্মত আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে এবং একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়তে সক্ষম হবে।

---

## ৩৬. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফিকহী ফুরু' (শাখা-মাসয়ালা)-তে ইখতিলাফের (মতপার্থক্য) কারণগুলো কী কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে এগুলো বিশ্লেষণ করেছেন?

## (ما هي أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع الفقهية؟ وكيف حللها الشاه ولي الله؟)

ভূমিকা:

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে ফিকহী মাসআলায় মতভেদ বা 'ইখতিলাফ' (الاختلاف) একটি ঐতিহাসিক সত্য। অনেকে একে বিভ্রান্তি মনে করলেও শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই মতভেদগুলো ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ইনসাফ' কিতাবে তিনি এর কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

## ইখতিলাফের কারণসমূহ (أسباب الاختلاف):

১. হাদিস পৌঁছানো বা না পৌঁছানো:

সকল সাহাবী সব হাদিস জানতেন না। কেউ হয়তো রাসূল (সা.)-এর একটি আমল দেখেছেন, অন্যজন দেখেননি। যিনি হাদিস পাননি, তিনি নিজের ইজতিহাদ বা কিয়াস দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। আর যিনি হাদিস পেয়েছেন, তিনি হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।

- **উদাহরণ:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) 'তাতবিক' (রুকুতে দুই হাত জোড় করা) মানসুখ হওয়ার হাদিস জানতেন না, তাই তিনি কিছুদিন তা আমল করেছেন।

২. হাদিসের মর্মার্থ বোঝার ভিন্নতা (ফাহম):

একই হাদিস শুনে সাহাবীদের বোঝার ধরনে পার্থক্য হতো। কেউ শব্দের বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, আবার কেউ রূপক বা গভীর অর্থ নিয়েছেন।

- **উদাহরণ:** রাসূল (সা.) বনি কুরায়জার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, **"কেউ যেন আসর না পড়ে সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত।"** একদল সাহাবী সময়মতো পথেই নামাজ পড়লেন (ভাবলেন উদ্দেশ্য ছিল তাড়াহুড়ো করা), অন্যরা সেখানে গিয়ে কাজা পড়লেন (শব্দকে আঁকড়ে ধরলেন)। রাসূল (সা.) কাউকেই তিরস্কার করেননি।

৩. রাসূল (সা.)-এর আমলের ভিন্নতা:

রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমল করেছেন (যেমন—আমিন জোরে ও আস্তে বলা, রফউল ইয়াদাইন করা ও না করা)। সাহাবীরা যা দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। এতে আমলের বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে।

৪. পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতা:

সাহাবীরা বিভিন্ন অঞ্চলে (কুফা, মদিনা, শাম) ছড়িয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয় প্রথা ও সমস্যার আলোকে তাঁদের ফতোয়ায় ভিন্নতা এসেছে।

## শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণ (تحليل الشاه ولي الله):

১. ইখতিলাফ রহমত স্বরূপ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, সাহাবীদের এই মতভেদ উম্মতের জন্য রহমত। এর ফলে শরীয়তে প্রশস্ততা (বিকল্প সুযোগ) তৈরি হয়েছে। মানুষ প্রয়োজনে যেকোনো সহীহ মতের ওপর আমল করতে পারে।

২. হকের বহুমুখিতা:

তিনি বলেন, ফিকহী মাসআলায় হক একাধিক হতে পারে। মুজতাহিদদের প্রত্যেকেই সওয়াব পাবেন। তিনি হানাফি ও শাফেয়ী—উভয় মতকেই সুন্নাহসম্মত বলে প্রমাণ করেছেন।

৩. মাযহাবী গোঁড়ামি নিরসন:

তিনি সাহাবীদের ইখতিলাফের উদাহরণ দিয়ে সমকালীন আলেমদের মাযহাবী গোঁড়ামি ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "সাহাবীরা মতভেদ করেছেন, কিন্তু একে অপরের পেছনে নামাজ পড়া ছাড়েননি।"

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইখতিলাফ কোনো বিভেদ নয়, বরং এটি ছিল ইলমী সমৃদ্ধির লক্ষণ। এই ইখতিলাফগুলোই পরবর্তীতে ফিকহী মাযহাবগুলোর ভিত্তি রচনা করেছে, যা ইসলামি আইনের বিশাল ভাণ্ডার।

---

## ৩৭. ইমামদের (ফুকাহাদের) মাযহাবগুলোর মধ্যে ইখতিলাফের মূল কারণগুলো কী? এ ইখতিলাফ কীভাবে উম্মতের জন্য রহমত হতে পারে?

## (ما هي الأسباب الرئيسية لاختلاف مذاهب الفقهاء؟ وكيف يمكن لهذا الاختلاف أن يكون رحمة للأمة؟)

ভূমিকা:

ইসলামি ফিকহের ইতিহাসে ফুকাহায়ে কেরাম ও ইমামগণের মধ্যকার মতভেদ বা 'ইখতিলাফ' (الاختلاف) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক বিষয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ইনসাফ'

গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, এই মতভেদগুলো কোনো বিশৃঙ্খলা নয়, বরং এটি ইলমী গবেষণার অপরিহার্য ফলাফল।

ফুকাহাদের ইখতিলাফের মূল কারণসমূহ (أسباب اختلاف الفقهاء):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইমামদের মতভেদের পেছনে প্রধানত চারটি মৌলিক কারণ চিহ্নিত করেছেন:

১. দলিলের ভিন্নতা (প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি):

সকল ইমামের কাছে সব হাদিস পৌঁছেনি। কোনো ইমাম হয়তো একটি হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন, অন্য ইমাম সেই হাদিসটি পাননি বা তাঁর কাছে সেটি সনদের বিচারে দুর্বল ছিল, তাই তিনি অন্য দলিলের ওপর আমল করেছেন।

- **উদাহরণ:** নামাজের রফউল ইয়াদাইন (হাত উঠানো)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে এটি সুন্নাত হওয়ার হাদিস প্রাধান্য পেয়েছে, আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে এটি মানসুখ (রহিত) হওয়ার দলিল প্রাধান্য পেয়েছে।

২. শব্দের অর্থের ভিন্নতা (লুগাত ও দালালাত):

কুরআন বা হাদিসের কোনো কোনো শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। একেক ইমাম একেক অর্থ গ্রহণ করেছেন।

- **উদাহরণ:** কুরআনে ওযুর আয়াতে **"লামাসতুমুন নিসা"** (নারীদের স্পর্শ করা) শব্দ এসেছে। ইমাম শাফেয়ী এর অর্থ নিয়েছেন 'ত্বক স্পর্শ করা' (তাই ওযু ভাঙ্গে), আর ইমাম আবু হানিফা অর্থ নিয়েছেন 'সহবাস করা' (তাই শুধু স্পর্শে ওযু ভাঙ্গে না)।

৩. উসূল বা মূলনীতির ভিন্নতা:

প্রত্যেক ইমাম ফিকহ বের করার জন্য নিজস্ব কিছু মূলনীতি (Principles) তৈরি করেছেন।

- **হানাফি উসূল:** খবরে ওয়াহিদের চেয়ে কুরআনের আম (সাধারণ) হুকুম শক্তিশালী।

- শাফেয়ী উসূল: সহীহ হলে খবরে ওয়াহিদ দিয়েই কুরআনের আম হুকুম খাস করা যায়।

এই উসূলের পার্থক্যের কারণে ফিকহী মাসআলায় পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

৪. কিয়াস ও ইজতিহাদের ভিন্নতা:

যেখানে সরাসরি নস নেই, সেখানে ইমামগণ কিয়াস করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতার কারণে তাঁদের কিয়াসের ফলাফলেও ভিন্নতা এসেছে।

ইখতিলাফ কীভাবে রহমত হতে পারে? (كيف يكون رحمة):

অনেকে মতভেদকে বিভক্তি মনে করেন, কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, এটি উম্মতের জন্য রহমত ও প্রশস্ততা।

- **প্রশস্ততা (Tawsi‘ah):** হাদিসে এসেছে, **"ইখতিলাফু উম্মাতি রাহমাহ"** (আমার উম্মতের মতভেদ রহমত)। এর অর্থ হলো, ইসলামি আইনে নমনীয়তা আছে। মানুষ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী এক ইমামের মত কঠিন হলে অন্য ইমামের সহজ মতটি গ্রহণ করতে পারে (শর্তসাপেক্ষে)।

- **হকের বহুমুখিতা:** আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যে তাঁর হুকুমগুলো বিভিন্নভাবে পালিত হোক। তাই সব ইমামই সঠিক পথে আছেন এবং প্রত্যেকেই সওয়াব পাবেন।

উপসংহার:

ফুকাহাদের ইখতিলাফ কোনো বৈরিতা নয়, বরং এটি শরীয়তের বাগানের বিভিন্ন রঙের ফুল। এই বৈচিত্র্য ইসলামি আইনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সব যুগের মানুষের জন্য পালনযোগ্য করেছে।

---

## ৩৮. "আহলুল হাদীস" ও "আহলুর রায়"-এর মধ্যকার পার্থক্যের মূল ভিত্তি কোথায়? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ দুই ধারার মধ্যকার ফারাক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

**(أين يكمن الأساس الرئيسي للفرق بين " أهل الحديث " و " أهل الرأي " ؟ وكيف شرح الشاه ولي الله الفارق بين هذين التيارين؟)**

ভূমিকা:

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই ইলম চর্চার দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়: 'আহলুল হাদিস' (হাদিসপন্থী) এবং 'আহলুর রায়' (যুক্তি ও প্রজ্ঞাপন্থী)। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) এই দুই ধারার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পার্থক্যের ভিত্তি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

পার্থক্যের মূল ভিত্তি (الأساس الرئيسي للفرق):

এই দুই দলের পার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি বা 'মানহাজুল ইস্তিনবাত'।

### ১. আহলুল হাদিস (أهل الحديث):

- **কেন্দ্র:** মদিনা ও হিজাজ অঞ্চল।
- **পদ্ধতি:** তাঁরা মাসআলার সমাধানের জন্য সরাসরি হাদিস ও আছার (সাহাবীদের বাণী) খুঁজতেন। তাঁরা কিয়াস বা যুক্তির ব্যবহার খুব কম করতেন এবং হাদিসের বাহ্যিক অর্থের (Zahir) ওপর আমল করতেন।
- **প্রতিনিধি:** ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)।

### ২. আহলুর রায় (أهل الرأي):

- **কেন্দ্র:** কুফা ও ইরাক অঞ্চল।
- **পদ্ধতি:** তাঁরা হাদিসের পাশাপাশি বিধানের পেছনের কারণ বা 'ইল্লত' তালাশ করতেন। তাঁরা মাসআলার সমাধানের জন্য কিয়াস এবং ইস্তিকরা (গভীর গবেষণা) পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করতেন। তাঁরা মনে করতেন,

হাদিস কম পাওয়া গেলে শরীয়তের মাকাসিদের আলোকে ফতোয়া দিতে হবে।

- **প্রতিনিধি:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর ব্যাখ্যা (شرح الشاه ولي الله):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) এই দুই ধারার মধ্যে চমৎকার সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেন:

- **ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণ:** মদিনায় প্রচুর হাদিস ও সুন্নাহর চর্চা ছিল, তাই সেখানে 'আহলুল হাদিস' ধারা প্রবল হয়েছে। অন্যদিকে ইরাকে নতুন নতুন সমস্যা (Nawazil) বেশি ছিল এবং হাদিস কম পৌঁছেছিল, তাই সেখানে মুজতাহিদগণ বাধ্য হয়ে 'রায়' বা কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন। এটি কোনো দোষের বিষয় নয়।

- **উভয়ের প্রয়োজনীয়তা:** তিনি বলেন, **"ফিকহ ছাড়া হাদিস বোঝা কঠিন, আবার হাদিস ছাড়া ফিকহ ভিত্তিহীন।"** আহলুল হাদিস সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন, আর আহলুর রায় সেই সুন্নাহ থেকে বিধান বের করার নিয়ম শিখিয়েছেন।

- **দ্বন্দ্ব নিরসন:** শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, আহলুর রায় মানে হাদিস অস্বীকারকারী নয়, বরং তাঁরা 'ফিকহুন নফস' বা গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। আবার আহলুল হাদিস মানে কেবল বর্ণনাকারী নয়, তাঁরাও সুন্নাহর ধারক ছিলেন। উভয় দলই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

**পার্থক্য নিরূপণ ছক:**

| বিষয় | আহলুল হাদিস | আহলুর রায় |
|---|---|---|
| **ভিত্তি** | রিওয়ায়াত (বর্ণনা) ও নস। | দিরায়াত (প্রজ্ঞা) ও কিয়াস। |
| **প্রধান কেন্দ্র** | মদিনা (হিজাজ)। | কুফা (ইরাক)। |
| **দৃষ্টিভঙ্গি** | শব্দের বাহ্যিক অর্থের ওপর জোর দেন। | বিধানের উদ্দেশ্য ও ইল্লতের ওপর জোর দেন। |

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, আহলুল হাদিস ও আহলুর রায় ইসলামের দুটি ডানা। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চলতে পারে না। তিনি উম্মতকে এই দুই ধারার সমন্বয়ে 'মধ্যপন্থী' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

---

## ৩৯. সাহাবীগণের ইজতিহাদের পদ্ধতি কেমন ছিল? তাদের ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও উম্মত কেন তাদের তাকলীদ (অনুসরণ) করবে?

## (كيف كان منهج اجتهاد الصحابة؟ ولماذا تتبع الأمة تقليدهم بالرغم من اختلافهم؟)

ভূমিকা:

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন উম্মতের প্রথম মুজতাহিদ এবং শরীয়তের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁদের ইজতিহাদের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ফিতরাত বা স্বভাবজাত। তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পুরো উম্মত তাঁদের অনুসরণ করতে বাধ্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) এর কারণগুলো যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন।

সাহাবীগণের ইজতিহাদের পদ্ধতি (منهج اجتهاد الصحابة):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ উল্লেখ করেন যে, সাহাবীদের ইজতিহাদ বর্তমান যুগের মতো কিতাবী বা পারিভাষিক উসূলের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তাঁদের পদ্ধতি ছিল:

১. কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি জ্ঞান:

তাঁরা কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে কুরআনে খুঁজতেন। না পেলে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ ও ফয়সালা দেখতেন।

- **পদ্ধতি:** তাঁরা আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান এবং রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যের কারণে আয়াতের শানে নুযূল ও প্রেক্ষাপট জানতেন, তাই তাঁদের ইজতিহাদে ভুলের সম্ভাবনা কম ছিল।

২. শুরা বা পরামর্শ:

হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে কোনো জটিল মাসআলা আসলে তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করতেন। সকলের রায়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন (ইজমা)।

৩. কিয়াস ও নাজির (উপমা):

নস না পেলে তাঁরা নতুন ঘটনাকে পুরনো ঘটনার সাথে তুলনা করতেন। যেমন— হযরত উমর (রা.) অনেক প্রশাসনিক বিষয়ে কিয়াস করেছেন।

৪. ফিকহুন নাফস (স্বভাবজাত প্রজ্ঞা):

তাঁদের অন্তরে দ্বীনের মেজাজ বা রুচি গেঁথে গিয়েছিল। তাই তাঁরা কোনো দলিল মুখস্থ না থাকলেও বুঝতে পারতেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা কী হতে পারে।

কেন উম্মত তাঁদের তাকলীদ করবে? (لماذا التقليد):

সাহাবীদের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো হলো:

১. রাসূল (সা.)-এর সাক্ষ্য:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ"

(আমার সাহাবীরা নক্ষত্রতুল্য, তোমরা যারই অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে।)

অর্থাৎ, তাঁদের প্রত্যেকের মতই হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. দ্বীনের বিশ্বস্ত মাধ্যম:

আমরা কুরআন ও হাদিস পেয়েছি তাঁদের মাধ্যমেই। যদি তাঁদের ইজতিহাদ বা বুঝ ভুল হয়, তবে পুরো দ্বীনই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "সাহাবীদের ইজমা হলো শরীয়তের অকাট্য দলিল।"

৩. খাইরুল কুরুনের মর্যাদা:

তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। তাঁদের ইখলাস ও তাকওয়া পরবর্তী যে কারো চেয়ে বেশি। তাই তাঁদের মতভেদও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ছিল।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, সাহাবীদের ইজতিহাদ হলো শরীয়তের মূল ভিত্তি। তাঁদের মতভেদ আমাদের জন্য প্রশস্ততার পথ খুলে দিয়েছে। তাই আমরা তাঁদের কাউকে ভুলের ওপর মনে করি না, বরং সকলকেই সত্যের মাপকাঠি মানি।

---

## ৪০. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ফুকাহাদের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে "তাকলীদ" (অনুসরণ)-এর বিধান কী? কখন একজন সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জরুরি?

## (ما هو حكم " التقليد " في حالة اختلاف الفقهاء عند الشاه ولي الله؟ ومتى يكون التقليد ضروريا للشخص العادي؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তে 'তাকলীদ' বা মুজতাহিদের অনুসরণ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাকলীদের ব্যাপারে কোনো চরমপন্থা অবলম্বন করেননি। তিনি অন্ধ তাকলিদ (জামুদ) এবং গায়রে মুকাল্লিদ (তাকলীদ বর্জন)—উভয় প্রান্তিকতা পরিহার করে এক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছেন।

তাকলীদের সংজ্ঞা:

'তাকলীদ' হলো দলিল না জেনেই কোনো বিশ্বস্ত মুজতাহিদের ফতোয়া বা রায়ের ওপর আমল করা।

তাকলীদের বিধান (حكم التقليد):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ব্যক্তির যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে তাকলীদের হুকুম ভিন্ন হয়:

১. মুজতাহিদের জন্য:

যিনি নিজে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করতে সক্ষম, তাঁর জন্য অন্যের তাকলীদ করা 'হারাম'। তাঁকে অবশ্যই নিজের গবেষণার ওপর আমল করতে হবে।

২. মুত্তাবি বা আলেমদের জন্য:

যিনি মূল দলিলগুলো জানেন কিন্তু ইজতিহাদ করতে পারেন না, তাঁর জন্য উচিত দলিলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করা। তবে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ইমামের উসূল মানতে পারেন।

৩. সাধারণ মানুষের (আওয়াম) জন্য:

যিনি আরবী জানেন না বা ফিকহ বোঝেন না, তাঁর জন্য তাকলীদ করা 'ওয়াজিব'। আল্লাহ বলেন, "ফাসআলু আহলাজ জিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন" (জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো)।

কখন তাকলীদ জরুরি? (متى يكون ضروريا):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'ইকদুল জীদ' কিতাবে সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জরুরি হওয়ার কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন:

১. সঠিক আমলের স্বার্থে:

সাধারণ মানুষ যদি তাকলীদ না করে নিজে নিজে হাদিস পড়ে আমল করতে যায়, তবে সে বিভ্রান্ত হবে এবং ভুল করবে। দ্বীনের হেফাজতের জন্য তাকে অবশ্যই কোনো ফকীহ বা মাযহাব মানতে হবে।

২. নফসের অনুসরণ রোধে:

যদি নির্দিষ্ট মাযহাব বা ইমামের তাকলীদ না থাকে, তবে মানুষ সুবিধাবাদী হয়ে যাবে। যখন যে ইমামের কথা সহজ মনে হবে (দলিল ছাড়া), তখন সে তাই মানবে। একে 'তালফিক' বা প্রবৃত্তি পূজা বলে, যা হারাম। মানুষকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য তাকলীদ জরুরি।

৩. বিচারিক ফয়সালায়:

বিচারক যখন কোনো মাযহাব অনুযায়ী রায় দেন, তখন তা মানা সবার জন্য জরুরি। রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে এক মাযহাবের অনুসরণ শৃঙ্খলা আনে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর সতর্কতা:

তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে, তাকলীদ যেন 'তাকদিস' (পবিত্রকরণ) বা 'জামুদ' (স্থবিরতা)-এ রূপ না নেয়। কোনো ইমামকে ভুলের ঊর্ধ্বে বা নবীর মতো মনে করা যাবে না। সহীহ হাদিস পেলে ইমামের রায় ছাড়ার মানসিকতা থাকতে হবে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর ফয়সালা হলো—তাকলীদ কোনো লক্ষ্য নয়, বরং দ্বীন পালনের একটি মাধ্যম। সাধারণ মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য রক্ষাকবচ, আর জ্ঞানীদের জন্য এটি গবেষণার সোপান।

---

## ৪১. আহলুর রায় (হানাফি মাযহাব)-এর মুজতাহিদগণ কোন উসূলগুলোকে অধিক প্রাধান্য দিতেন? তাদের এ প্রাধান্যের কারণ কী ছিল?

## (ما هي الأصول التي أولاها مجتهدو أهل الرأي (المذهب الحنفي) أهمية أكبر؟ وما هو سبب هذا الترجيح؟)

ভূমিকা:

ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশের ইতিহাসে 'আহলুর রায়' (যুক্তি ও প্রজ্ঞাপন্থী) একটি প্রভাবশালী ধারা। কুফা ও ইরাককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই ধারার নেতৃত্ব দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর অনুসারী হানাফি মুজতাহিদগণ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে আহলুর রায়ের মূলনীতি ও তার কারণগুলো অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

**আহলুর রায়-এর প্রাধান্য দেওয়া উসূলসমূহ (الأصول المرجحة عند أهل الرأي):**

আহলুর রায় বা হানাফি মুজতাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি বিচার-বুদ্ধি ও গবেষণালব্ধ দলিলগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাদের প্রাধান্য দেওয়া প্রধান উসূলগুলো হলো:

১. কিয়াস (القياس):

যখন কোনো নতুন সমস্যার সমাধান কুরআন বা হাদিসে সরাসরি পাওয়া যেত না, তখন তাঁরা সমজাতীয় কোনো বিধানের সাথে তুলনা করে (কিয়াস) সমাধান বের করতেন। তাঁরা খবযে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা)-এর চেয়ে শক্তিশালী কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন, যদি সেই হাদিসটি উসূলের বিপরীত হতো।

২. ইস্তিহসান (الاستحسان):

এটি হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাহ্যিক কিয়াস বা যুক্তির চেয়ে যখন জনকল্যাণ বা শরীয়তের গভীর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, তখন তাঁরা কিয়াস ছেড়ে 'ইস্তিহসান' বা উত্তম পন্থা গ্রহণ করতেন।

৩. কুরআনের আম (সাধারণ) হুকুমের প্রাধান্য:

তাঁদের মতে, কুরআনের 'আম' (সাধারণ) শব্দ অকাট্য (কাত'ঈ)। তাই তাঁরা খবযে ওয়াহিদ (যা যন্নী বা ধারণামূলক) দিয়ে কুরআনের আম হুকুমকে খাস বা সীমাবদ্ধ করতেন না।

- **উদাহরণ:** কুরআনে বলা হয়েছে, "কুরআন থেকে যা সহজ হয় পড়"। তাই নামাজে ফাতিহা পড়াই ফরজ নয়, যেকোনো আয়াত পড়লেই ফরজ আদায় হবে। হাদিস দিয়ে একে সীমাবদ্ধ করা যাবে না (তবে সুন্নাত সাব্যস্ত হবে)।

৪. ফকীহ রাবীর হাদিস গ্রহণ:

হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা বর্ণনাকারীর (রাবী) ফিকহী জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিতেন। রাবী যদি ফকীহ না হন এবং তাঁর বর্ণনা যদি কিয়াসের বিপরীত হয়, তবে তাঁরা সেই হাদিস বর্জন করতেন।

**এ প্রাধান্যের কারণসমূহ (أسباب هذا الترجيح):**

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) আহলুর রায়ের এই উসূল গ্রহণের পেছনে যৌক্তিক ও পরিবেশগত কারণগুলো তুলে ধরেছেন:

১. হাদিসের স্বল্পতা ও কঠোর যাচাই:

ইরাক ছিল মদিনা থেকে অনেক দূরে। সেখানে সাহাবীদের সংখ্যা কম ছিল এবং হাদিস জাল করার প্রবণতা (ফিতনা) বেশি ছিল। তাই হানাফি ইমামগণ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করতেন এবং হাদিসের চেয়ে কুরআন ও ইজতিহাদের ওপর বেশি নির্ভর করতেন।

২. নতুন সমস্যা (নাওয়াজিল)-এর আধিক্য:

ইরাক ছিল একটি উন্নত ও জটিল নগর সভ্যতা। সেখানে এমন হাজারো নতুন সমস্যা দেখা দিত যা মদিনার সাদাসিধা জীবনে ছিল না। এই নতুন সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য নস (Text) যথেষ্ট ছিল না, তাই ব্যাপকহারে 'কিয়াস' ও 'ইস্তিহসান'-এর প্রয়োজন পড়েছিল।

৩. মাসলাহাত বা জনকল্যাণ:

আহলুর রায়ের ইমামগণ শাব্দিক অর্থের চেয়ে শরীয়তের উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) দিকে বেশি নজর দিতেন। তাঁরা দেখতেন কোন ফতোয়ায় মানুষের কল্যাণ ও দ্বীনের হেফাজত বেশি হয়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, আহলুর রায় বা হানাফি মুজতাহিদগণ প্রবৃত্তি পূজারী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন 'আসহাবুল ফিকহ ওয়ান নজর' (গভীর প্রজ্ঞাবান)। যুগের প্রয়োজনে এবং শরীয়তকে গতিশীল রাখার স্বার্থেই তাঁরা কিয়াস ও ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

---

## ৪২. ইখতিলাফের এ আলোচনার মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইসলামের উদারতা ও ফিকহী প্রশস্ততা তুলে ধরেছেন?

## (كيف أبرز الشاه ولي الله سماحة الإسلام وسعته الفقهية من خلال هذه المناقشة حول الاختلاف؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে ফিকহী ইখতিলাফ বা মতভেদকে কোনো সমস্যা হিসেবে দেখেননি, বরং একে ইসলামের সৌন্দর্য ও নমনীয়তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এই মতভেদগুলো উম্মতের জন্য সংকীর্ণতা নয়, বরং প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

**ইসলামের উদারতা ও প্রশস্ততা (سماحة الإسلام وسعته):**

১. হক বা সত্যের বহুমুখিতা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যে তাঁর বান্দারা বিভিন্ন উপায়ে তাঁর ইবাদত করুক। তাই তিনি কিছু বিধানকে অস্পষ্ট রেখেছেন যাতে মুজতাহিদগণ গবেষণা করে বিভিন্ন সুরত বের করতে পারেন।

- **বিশ্লেষণ:** যেমন নামাজে হাত বাঁধার নিয়ম বা আমীন বলার পদ্ধতি। এগুলো নিয়ে মতভেদ থাকায় মানুষ যে কোনো একটি সহীহ পদ্ধতির ওপর আমল করলেই ইবাদত কবুল হবে। এটি ইসলামের উদারতা।

২. রুখসত বা সহজীকরণের সুযোগ:

ইখতিলাফের কারণে শরীয়তে 'আযিমাহ' (কঠিন বিধান) এবং 'রুখসত' (সহজ বিধান)—উভয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থতা বা সফরের কারণে এক মাযহাবের কঠিন আমল করতে অক্ষম হয়, তবে সে অন্য মাযহাবের সহজ মতটি গ্রহণ করতে পারে (শর্তসাপেক্ষে)। এটি উম্মতের জন্য বিশাল রহমত।

৩. মাযহাবী সহনশীলতা:

তিনি সাহাবী ও তাবেয়ীদের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা মতভেদ করা সত্ত্বেও একে অপরের পেছনে নামাজ পড়তেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই আলোচনার মাধ্যমে সমকালীন আলেমদের মাযহাবী গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন:

"الْحَقُّ لَا يَنْحَصِرُ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ"

(হক বা সত্য কেবল একটি মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।)

৪. সর্বজনীনতা প্রমাণ:

ইসলাম যে কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা অঞ্চলের জন্য নয়, তা এই ফিকহী প্রশস্ততা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। হানাফি ফিকহ যেমন ইরাকের নগর জীবনের উপযোগী ছিল, মালিকি ফিকহ তেমনি মদিনার জীবনের উপযোগী ছিল। এই বৈচিত্র্য ইসলামকে বিশ্বজনীন করেছে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ফিকহী ইখতিলাফ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি বিশেষ উপহার। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন কোনো অনড় পাথর নয়, বরং এটি একটি প্রবহমান নদী যা সব যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

---

## ৪৩. "আসবাবু ইখতিলাফিল মাযাহিব" অধ্যায়টি কিতাবের প্রধান উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) অর্জনে কী ভূমিকা রাখে?

## (ما هو الدور الذي يلعبه باب " أسباب اختلاف المذاهب " في تحقيق المقاصد الرئيسية للكتاب؟)

ভূমিকা:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো—ইসলামি শরীয়তের বিধানগুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা এবং উম্মতের মধ্যকার বিভেদ ও বিভ্রান্তি দূর করা। এই লক্ষ্যে 'আসবাবু ইখতিলাফিল মাযাহিব' (মাযহাবগুলোর মতভেদের কারণ) অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পাঠকদের অন্ধ বিশ্বাস থেকে বের করে সত্যের আলোয় নিয়ে আসে।

**কিতাবের উদ্দেশ্য অর্জনে ভূমিকা (الدور في تحقيق المقاصد):**

১. বিভ্রান্তি নিরসন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা:

তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষ মনে করত, "আমার মাযহাবই একমাত্র সঠিক, বাকি সব বাতিল।" এই ধারণা উম্মতের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল। এই অধ্যায়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মতভেদের প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক কারণগুলো (যেমন—হাদিস না পৌঁছা, বোঝার ভিন্নতা) তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে, সব ইমামই সত্যের সন্ধানী ছিলেন। এতে মানুষের মন থেকে ঘৃণা দূর হয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. শরীয়তের হিকমত অনুধাবন:

কিতাবের উদ্দেশ্য হলো 'আসরারুশ শরীয়াহ' বা শরীয়তের রহস্য বোঝানো। এই অধ্যায়টি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা কেন সব বিধান স্পষ্ট

করেননি। এর রহস্য হলো—উম্মতকে গবেষণার সুযোগ দেওয়া এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া।

৩. মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মেলবন্ধন:

এই কিতাবের একটি লক্ষ্য ছিল হাদিসপন্থী ও ফিকহপন্থীদের দূরত্ব কমানো। এই অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, ফিকহী মতভেদগুলো মূলত হাদিসের ব্যাখ্যারই ভিন্নতা। এর মাধ্যমে তিনি দুই পক্ষকে এক টেবিলে নিয়ে এসেছেন।

৪. ইজতিহাদের পথ সুগম করা:

তিনি দেখিয়েছেন, সাহাবী ও ইমামগণ কীভাবে মতভেদ করেছেন। এটি পরবর্তী যুগের আলেমদের জন্য ইজতিহাদ করার অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি বুঝিয়েছেন, ভিন্নমত পোষণ করা অপরাধ নয়, যদি তা দলিলের ভিত্তিতে হয়।

৫. ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (ই'তিদাল):

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের 'ইফরাত' (মাযহাবকে দ্বীন বানিয়ে ফেলা) এবং 'তাফরিত' (মাযহাব অস্বীকার করা)—উভয় প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন।

উপসংহার:

'আসবাবু ইখতিলাফিল মাযাহিব' অধ্যায়টি হলো 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এটি না থাকলে কিতাবের সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এটি উম্মতকে মাযহাবী সংকীর্ণতার অন্ধকার থেকে বের করে কুরআন-সুন্নাহর উদার আকাশের নিচে নিয়ে আসে।

---

## ৪৪. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে ইখতিলাফের কারণ হিসেবে "আল-ইতলাক ওয়াত-তাকয়ীদ" (নিরঙ্কুশতা ও সীমাবদ্ধতা)-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ( حلل دور " الإطلاق والتقييد " كسبب للاختلاف بين الصحابة والتابعين )

ভূমিকা:

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতভেদের অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো 'আল-ইতলাক ওয়াত-তাকয়ীদ' (الإطلاق والتقييد)।

অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর কোনো নির্দেশ কি সাধারণ ও শর্তহীন (মুতলাক), নাকি বিশেষ ও শর্তযুক্ত (মুকাইয়্যিদি)—এটা বোঝা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) এই ভাষাতাত্ত্বিক ও উসূলী কারণটি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

**ইতলাক ও তাকয়ীদ-এর ভূমিকা বিশ্লেষণঃ**

১. ইতলাক (নিরঙ্কুশতা):

রাসূল (সা.) হয়তো কোনো হুকুম দিয়েছেন সাধারণভাবে, কোনো শর্ত উল্লেখ করেননি। একদল সাহাবী সেই সাধারণ হুকুমটিকেই গ্রহণ করেছেন।

- **উদাহরণঃ** রাসূল (সা.) বলেছেন, **"জমিন যা উৎপন্ন করে (শস্য), তাতে উশর (১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত) দিতে হবে।"** এটি একটি 'মুতলাক' বা সাধারণ হুকুম। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কম হোক বা বেশি, সব ফসলেই উশর দিতে হবে।

২. তাকয়ীদ (সীমাবদ্ধতা):

অন্য সাহাবীরা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, রাসূল (সা.) অন্য কোনো সময় বা প্রেক্ষাপটে সেই হুকুমের সাথে কোনো শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অথবা তাঁরা যুক্তির মাধ্যমে বুঝেছেন যে, এখানে একটি শর্ত আছে।

- **উদাহরণঃ** পূর্বের উশরের হাদিসটির ক্ষেত্রে অন্য ইমামগণ (যেমন সাহিবাঈন ও শাফেয়ী) বলেন, রাসূল (সা.) অন্য হাদিসে বলেছেন, **"৫ ওয়াসাক (নির্দিষ্ট পরিমাণ)-এর নিচে যাকাত নেই।"** এটি আগের হুকুমকে 'তাকয়ীদ' বা সীমাবদ্ধ করেছে। তাই তাঁরা বলেন, অল্প ফসলে উশর নেই।

৩. মতভেদের সৃষ্টি:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, মতভেদ হয় তখন, যখন—

- কেউ মনে করেন হুকুমটি সব সময়ের জন্য সাধারণ (মুতলাক)।
- অন্য কেউ মনে করেন, না, এটি বিশেষ কোনো কারণ বা শর্তের সাথে যুক্ত (মুকাইয়্যিদি)।

৪. ওযুর বিধানের উদাহরণ:

কুরআনে বলা হয়েছে, "নারীদের স্পর্শ করলে ওযু কর"। এখানে 'স্পর্শ' শব্দটি মুতলাক।

- **হযরত ইবনে উমর (রা.):** তিনি একে মুতলাক ধরেছেন, তাই বলেছেন—যেকোনো স্পর্শেই ওযু ভাঙ্গবে।
- **হযরত ইবনে আব্বাস (রা.):** তিনি একে 'সহবাস'-এর অর্থে মুকাইয়্যিদ (সীমাবদ্ধ) করেছেন। তাই বলেছেন—শুধু স্পর্শে ওযু ভাঙ্গবে না।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, 'ইতলাক ও তাকয়ীদ' বোঝার ভিন্নতা সাহাবীদের ইজতিহাদী যোগ্যতার প্রমাণ। কেউ শব্দের ব্যাপকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আবার কেউ শব্দের পেছনের উদ্দেশ্য বা শর্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই উভয় পদ্ধতিই শরীয়তসম্মত এবং সত্য উদঘাটনের মাধ্যম।

---

## ৪৫. চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম সমাজের সার্বিক অবস্থা কেমন ছিল? সে সময়ের ইলম চর্চা ও ফিকহী ধারা কেমন ছিল?

## (كيف كان حال المجتمع المسلم قبل المائة الرابعة الهجرية؟ وكيف كان تداول العلم والثيار الفقهي في ذلك الوقت؟)

ভূমিকা:

ইসলামি ফিকহের ইতিহাসে চতুর্থ হিজরী শতাব্দী একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে এই সময়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার এক চমৎকার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়কে তিনি ফিকহী স্বাধীনতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

### চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সমাজের অবস্থা (حال المجتمع قبل المائة الرابعة):

১. তাকলিদের অনুপস্থিতি:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম সমাজে কোনো নির্দিষ্ট একজন ইমামের বা মাযহাবের অন্ধ তাকলিদ (অনুসরণ) করার প্রচলন ছিল না। মানুষ মাসআলার জন্য যেকোনো যোগ্য আলেম বা মুফতির কাছে যেত।

- **আরবি ইবারত: " لَمْ يَكُنِ النَّاسُ مُجْتَمِعِينَ عَلَى تَقْلِيدِ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ"** (লোকেরা নির্দিষ্ট কোনো এক মাযহাবের তাকলিদের ওপর একমত ছিল না।)

২. দলিলের প্রাধান্য:

সে সময়ের সাধারণ মানুষও আলেমদের জিজ্ঞেস করত—"এই ফতোয়ার দলিল কী?" তারা কেবল ইমামের কথায় সন্তুষ্ট হতো না, বরং কুরআন ও সুন্নাহর দলিল জানতে চাইত। এটি ছিল খাইরুল কুরুনের বৈশিষ্ট্য।

৩. মাযহাবী সংকীর্ণতামুক্ত:

তখনকার আলেম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মাযহাবী গোঁড়ামি ছিল না। একজন হানাফি ফকীহের কাছে শাফেয়ী মতের কেউ ফতোয়া চাইলে তিনি নিঃসঙ্কোচে সঠিক সমাধান দিতেন। কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবকে 'দ্বীন' মনে করা হতো না।

**ইলম চর্চা ও ফিকহী ধারা (تداول العلم والتيار الفقهي):**

সে সময়ের ইলম চর্চার ধারা ছিল নিম্নরূপ:

১. ইজতিহাদের ব্যাপকতা:

যোগ্য আলেমগণ নিজেরাই কুরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা বের করতেন (ইজতিহাদ)। তাঁরা অন্যের অন্ধ অনুসরণকে ইলমের জন্য অপমানজনক মনে করতেন।

২. হাদিস ও আছার নির্ভরতা:

সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে ফিকহ ছিল মূলত হাদিস ও আছার (সাহাবীদের বাণী) নির্ভর। কিয়াস বা যুক্তির ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত এবং কেবল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে।

৩. ফতোয়া প্রদানের পদ্ধতি:

মুফতিগণ ফতোয়া দেওয়ার সময় বলতেন, "এটি আমার রায়, ভুলও হতে পারে।" তাঁরা নিজেদের মতকে চূড়ান্ত সত্য বলে দাবি করতেন না।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগ ছিল ইসলামি আইনের স্বর্ণযুগ। তখন ইজতিহাদের দরজা ছিল উন্মুক্ত এবং মানুষের সম্পর্ক ছিল সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে। কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের গণ্ডিতে ইসলাম তখনো আবদ্ধ হয়নি।

---

## ৪৬. চতুর্থ শতাব্দীর পরে মুসলিম সমাজের অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন এসেছিল? এ পরিবর্তন ইলম ও মাযহাবগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল? (ما هي أنواع التغييرات التي طرأت على حال المجتمع المسلم بعد المائة الرابعة؟ وما هو تأثير هذا التغيير على العلم والمذاهب؟)

ভূমিকা:

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পর মুসলিম উম্মাহর ফিকহী চিন্তাধারায় এক আমূল পরিবর্তন আসে, যাকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'ইনকিলাব' বা বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। তবে এটি ছিল নেতিবাচক বিপ্লব, যা উম্মতকে ইজতিহাদ থেকে সরিয়ে তাকলিদের দিকে ঠেলে দেয়।

### মুসলিম সমাজের অবস্থার পরিবর্তন (التغييرات في المجتمع):

১. নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলিদ শুরু:

এই সময় থেকে মানুষ মনে করতে শুরু করে যে, হকের ওপর থাকার জন্য নির্দিষ্ট যে কোনো একটি মাযহাব (হানাফি, শাফেয়ী, মালিকি বা হাম্বলি) মানা ওয়াজিব। এক মাযহাবের লোক অন্য মাযহাবের ফতোয়া মানা বা আমল করাকে দূষণীয় মনে করতে থাকে।

২. ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা:

তৎকালীন আলেমগণ ঘোষণা করেন যে, মুজতাহিদ হওয়ার মতো যোগ্যতা আর কারো নেই। তাই এখন থেকে আর নতুন ইজতিহাদ করা যাবে না, কেবল পূর্ববর্তী ইমামদের ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিতে হবে। একে 'ইনসিদাদু বাবিল ইজতিহাদ' (ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়া) বলা হয়।

৩. মাযহাবী দলাদলি:

সমাজের মানুষ বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। বাগদাদ ও নিশাপুরে হানাফি ও শাফেয়ীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়।

**ইলম ও মাযহাবগুলোর ওপর প্রভাব (التأثير على العلم والمذاهب):**

১. ইলমের সংকোচন:

আগে ইলম ছিল কুরআন ও হাদিস গবেষণা করা। এখন ইলম হয়ে দাঁড়ায়— ইমামের কিতাব মুখস্থ করা এবং তাঁর রায়ের পক্ষে দলিল খোঁজা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "ফকীহরা নস (হাদিস) ছেড়ে ইমামের কওলের (বক্তব্য) ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করল।"

২. তাখরীজ ও তারজীহ:

আলেমদের কাজ ইজতিহাদ থেকে সরে এসে 'তাখরীজ' (ইমামের উসূল দিয়ে মাসআলা বের করা) এবং 'তারজীহ' (ইমামের একাধিক মতের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩. হাদিসের সাথে দূরত্ব:

অনেক ক্ষেত্রে মাযহাব রক্ষা করতে গিয়ে সহীহ হাদিসকে তাওয়ীল (অপব্যাখ্যা) বা মানসুখ (রহিত) বলার প্রবণতা দেখা দেয়। এটি ছিল ইলমের জন্য এক বড় বিপর্যয়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, চতুর্থ শতাব্দীর এই পরিবর্তন উম্মতের জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়। তাকলিদ-ই-শখছি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ উম্মতকে কুরআন-সুন্নাহর প্রশস্ততা থেকে সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

## ৪৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কেন এ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (চতুর্থ শতাব্দীর আগের ও পরের অবস্থা) কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

## (لماذا أدرج الشاه ولي الله هذا التحليل التاريخي (حول ما قبل وبعد المائة الرابعة) في الكتاب؟ وما هو الهدف منه؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) কোনো ইতিহাসবিদ ছিলেন না, কিন্তু 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে তিনি ফিকহী ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ। তিনি কেবল ঘটনা বর্ণনা করার জন্য নয়, বরং উম্মতকে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়ার জন্য এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

**ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করার কারণ ও উদ্দেশ্য:**

১. মাযহাবী গোঁড়ামি দূর করা (ইজালাতুল আসাবিয়্যাহ):

তাঁর সমসাময়িক যুগে মাযহাবী গোঁড়ামি চরম পর্যায়ে ছিল। মানুষ মনে করত, নির্দিষ্ট মাযহাব মানা ফরজ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে (প্রথম ৩০০ বছর) এই প্রথা ছিল না। যদি এটি ফরজ হতো, তবে সেরা যুগের মানুষরা তা পালন করতেন।

- **উদ্দেশ্য:** মানুষকে বোঝানো যে, নির্দিষ্ট মাযহাব মানা কোনো দ্বীনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি একটি পরবর্তী যুগের ব্যবস্থা।

২. ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত করা:

লোকে বিশ্বাস করত ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি দেখালেন যে, এটি মানুষের তৈরি করা ধারণা। আল্লাহ বা রাসূল (সা.) কখনো ইজতিহাদ বন্ধ করেননি।

- **উদ্দেশ্য:** যোগ্য আলেমদেরকে আবার কুরআন-সুন্নাহ গবেষণায় ফিরিয়ে আনা।

৩. ফিকহ ও হাদিসের সমন্বয়:

তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর পরে ফিকহ হাদিস থেকে দূরে সরে গেছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফিকহকে আবার হাদিসের ভিত্তির ওপর স্থাপন করা।

৪. উম্মতের ঐক্যের ডাক:

তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মাযহাবগুলো পরে তৈরি হয়েছে, মূল ইসলাম এক। এই ইতিহাস জানার পর শাফেয়ী ও হানাফিদের মধ্যে বিভেদ কমে আসবে এবং তারা একে অপরকে ভাই মনে করবে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলাহ' বা সংস্কার। তিনি চেয়েছিলেন উম্মত যেন তাকলিদের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আবার সুন্নাহর আলোয় আলোকিত হয়। তিনি প্রমাণ করেছেন, "মাযহাব দ্বীনের জন্য, মাযহাবের জন্য দ্বীন নয়।"

---

## ৪৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, চতুর্থ শতাব্দীর পর ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে নতুন কী কী সমস্যা ও প্রবণতা দেখা গিয়েছিল?

## (ما هي المشكلات والاتجاهات الجديدة التي ظهرت في علم الفقه والحديث بعد المائة الرابعة عند الشاه ولي الله؟)

ভূমিকা:

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পর মুসলিম বিশ্বে ইলম চর্চার পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আসে, তা ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রে কিছু নতুন সমস্যা ও নেতিবাচক প্রবণতার জন্ম দেয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন।

**ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রে নতুন সমস্যা ও প্রবণতা:**

১. জিদাল ও মুনাযারা (তর্ক-বিতর্ক):

এই যুগে ফিকহের মূল উদ্দেশ্য আমল করা থেকে সরে গিয়ে 'মুনাযারা' বা তর্কে জেতার হাতিয়ারে পরিণত হয়। মাদরাসাগুলোতে এমন বিদ্যা শেখানো হতো

যাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। একে 'ইলমুল খিলাফ' বা বিতর্কশাস্ত্র বলা হতো।

- **প্রবণতা:** হকের অনুসন্ধান নয়, বরং মাযহাবের বিজয়ই ছিল মূল লক্ষ্য।

২. হাদিসের অপব্যাখ্যা (তাওয়ীল):

যখন কোনো সহীহ হাদিস নিজের মাযহাবের বিপরীত হতো, তখন ফকীহরা সেই হাদিস মানার পরিবর্তে নানা রকম দূরবর্তী ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) করতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "তারা হাদিসকে মাযহাবের অনুগত করার চেষ্টা করত, মাযহাবকে হাদিসের অনুগত করত না।"

৩. জাল হাদিসের ব্যবহার:

নিজের মাযহাবের মতকে শক্তিশালী করার জন্য অনেকে দুর্বল ও জাল হাদিসের আশ্রয় নিতেন। এতে ইলমে হাদিসের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

৪. ফিকহী কল্পকাহিনী (হিয়াল):

শরীয়তের কঠিন বিধান থেকে বাঁচার জন্য ফকীহরা নানা রকম 'হিলা-বাহানা' (Legal Stratagems) বা কৌশল আবিষ্কার করতে শুরু করেন। যেমন—যাকাত ফাঁকি দেওয়ার জন্য বছরের শেষ দিনে সম্পদ স্ত্রীকে হেবা করে দেওয়া। এটি শরীয়তের মাকাসিদের বিরোধী ছিল।

৫. সংক্ষিপ্তসার ও নোটবই নির্ভরতা (মুখতাসারাত):

মানুষ মূল কিতাব (যেমন—মুয়াত্তা, কিতাবুল উম্ম) পড়া ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের সংক্ষিপ্ত নোটবই বা 'মুখতাসারাত' এবং তার ওপর লেখা ব্যাখ্যাগ্রন্থ (হাশিয়া) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে ইলমের গভীরতা কমে যায়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই সমস্যাগুলো তুলে ধরে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এই কৃত্রিমতা পরিহার করে আবার 'আস-সালাফ আস-সালেহীন'-এর সরল ও বিশুদ্ধ পথে ফিরে আসার জন্য, যেখানে ফিকহ ও হাদিস ছিল একে অপরের পরিপূরক।

## ৪৯. এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর যুগে (সমকালে) বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করতে চেয়েছিলেন?

## (على ضوء هذا الوصف التاريخي، كيف أراد الشاه ولي الله حل المشكلات القائمة في عصره؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) কেবল সমস্যা চিহ্নিতকারী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন 'মুসলিহ' বা সংস্কারক। ফিকহী ইতিহাসের সুগভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তাঁর সমকালীন মুসলিম সমাজে বিদ্যমান স্থবিরতা, মাযহাবী গোঁড়ামি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তবসম্মত সমাধান পেশ করেছিলেন।

**সমকালীন সমস্যা সমাধানে শাহ ওয়ালী উল্লাহর প্রস্তাবিত পদ্ধতি ( طريقة الحل المقترحة):**

শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের আলোকে সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের আহ্বান জানান:

১. কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى الكتاب والسنة):

তিনি লক্ষ্য করেন যে, মানুষ ফিকহের কিতাব ও হাশিয়া (নোট) নিয়ে এত ব্যস্ত যে, মূল উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে দূরে সরে গেছে।

- **সমাধান:** তিনি মাদরাসার পাঠ্যক্রমে 'সিহাহ সিত্তাহ' ও 'মুয়াত্তা মালিক' অন্তর্ভুক্ত করার এবং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা বোঝার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, **"মূল উৎসে ফিরে যাওয়াই হলো সকল বিবাদ মিটানোর একমাত্র পথ।"**

২. মাযহাবী গোঁড়ামি বর্জন ও উদারতা (ترك التعصب المذهبي):

সমাজে হানাফি ও শাফেয়ীদের মধ্যে চরম বিবাদ ছিল। প্রত্যেকে নিজের ইমামকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করত।

- **সমাধান:** তিনি ঐতিহাসিক দলিল দিয়ে প্রমাণ করেন যে, সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে এমন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি আহ্বান জানান, **"তোমরা**

**মাযহাব মানো, কিন্তু মাযহাবকে দ্বীন বানিয়ে ফেলো না।"** তিনি মাযহাবগুলোর মধ্যে 'তাতবীক' বা সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করেন।

৩. ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্তকরণ (فتح باب الاجتهاد):

তৎকালীন আলেমদের ধারণা ছিল, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে নতুন সমস্যা (যেমন—ঔপনিবেশিক শাসন, নতুন অর্থনীতি) সমাধানে তারা ব্যর্থ হচ্ছিল।

- **সমাধান:** শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঘোষণা করেন, **"ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা।"** তিনি যোগ্য আলেমদের ইজতিহাদ করার আহ্বান জানান, যাতে ইসলাম যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

৪. সঠিক তাসাউফের চর্চা (إصلاح التصوف):

সমাজে ভণ্ড পীর ও বিদআতী সুফিদের দৌরাত্ম্য ছিল। তারা শরীয়ত বাদ দিয়ে কেবল মারেফতের দাবি করত।

- **সমাধান:** তিনি তাসাউফকে শরীয়তের অধীন করেন। তিনি বলেন, **"যে পীর বা সুফি শরীয়ত মানে না, সে শয়তানের দোসর।"** তিনি সুফিদের খানকাহ থেকে বের হয়ে জিহাদ ও সমাজ সংস্কারে অংশ নেওয়ার ডাক দেন।

৫. ফিকহ ও হাদিসের সমন্বয়:

তিনি ফিকহকে হাদিসের মুখোমুখি দাঁড় করানোর পরিবর্তে ফিকহকে হাদিসের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যদি কোনো ফিকহী মাসআলা সহীহ হাদিসের খেলাফ হয়, তবে হাদিস মানাই ওয়াজিব।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর সমাধানগুলো ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি পুরোনোকে ভেঙে ফেলেননি, আবার নতুনের অন্ধ অনুসরণও করেননি। বরং তিনি 'আস-সালাফ আস-সালেহীন'-এর পদ্ধতির আলোকে সমকালীন সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

## ৫০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে তাঁর যুগে তাকলীদ (অনুসরণ) এবং ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর ভারসাম্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন?
## ( كيف دعا الشاه ولي الله إلى الموازنة بين التقليد والاجتهاد في عصره؟ )

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর যুগে উলামা সমাজ দুই চরমপন্থী দলে বিভক্ত ছিল। একদল অন্ধ তাকলীদের (তাকলিদে জামিদ) পক্ষে ছিল, আর অন্যদল তাকলিদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই দুই প্রান্তিকতার মাঝে 'ই'তিদাল' বা মধ্যপন্থার এক অনন্য নজির স্থাপন করেন।

**তাকলীদ ও ইজতিহাদের ভারসাম্য রক্ষার আহ্বান (الدعوة إلى الموازنة):**

শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাকলীদ ও ইজতিহাদের ভারসাম্য রক্ষায় নিম্নোক্ত নীতিগুলো পেশ করেন:

১. তাকলীদের স্তর নির্ধারণ:

তিনি বলেন, তাকলীদ সবার জন্য এক রকম নয়।

- **সাধারণ মানুষ (আওয়াম):** যারা দলিল বোঝে না, তাদের জন্য তাকলীদ করা **ওয়াজিব**। তাদের জন্য নির্দিষ্ট মাযহাব মানাই নিরাপদ।
- **আলেম ও গবেষক:** যারা কুরআন-হাদিস বোঝেন, তাদের জন্য অন্ধ তাকলীদ করা **হারাম**। তাদের উচিত দলিলের ভিত্তিতে আমল করা।

২. অন্ধ তাকলীদের বিরোধিতা:

তিনি তাকলীদকে সম্মান করতেন, কিন্তু 'তাকলিদে জামিদ' বা অন্ধ স্থবিরতার কঠোর বিরোধী ছিলেন।

- **যুক্তি:** যদি কোনো ইমামের মত সহীহ হাদিসের স্পষ্ট বিরোধী হয়, তবুও গোঁড়ামি করে সেই মত আঁকড়ে ধরে থাকাকে তিনি শির্ক ফীল আমল বা রাসূলের অবমাননা তুল্য মনে করতেন। তিনি বলেন, **"হাদিস পাওয়ার পর ইমামের রায় ছাড়া ওয়াজিব।"**

৩. ইজতিহাদের প্রকারভেদ ও প্রয়োগ:

তিনি ইজতিহাদকে কেবল 'মুজতাহিদ মুতলাক' (যেমন আবু হানিফা)-এর জন্য খাস করেননি। তিনি 'ইজতিহাদ মুনতাসিব' বা মাযহাবের ভেতরে থেকে গবেষণার কথা বলেন।

- **পদ্ধতি:** একজন হানাফি আলেম হানাফি উসূল মেনেও নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। তাকে নতুন মাযহাব বানাতে হবে না, কিন্তু গবেষণাও থামানো যাবে না।

৪. তালফিক বা সংমিশ্রণের সতর্কতা:

তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন যেন তারা প্রবৃত্তির অনুসরণে যখন যে মাযহাব সুবিধা দেয়, তা গ্রহণ না করে (তালফিক)। এটি দ্বীনের খেলাফ। তবে প্রয়োজনে বা বিপদে পড়লে যোগ্য মুফতির পরামর্শে অন্য মাযহাবের সহজ মত গ্রহণ করা বৈধ (রুখসত)।

৫. ইনসাফভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি:

তিনি বলেন, কোনো মাযহাবই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই অন্যের মাযহাবকে বাতিল বা গুমরাহ বলা যাবে না। হানাফি হয়েও শাফেয়ী মতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও ফিকহ চর্চা একসাথে বিকশিত হয়েছে। তিনি শিখিয়েছেন যে, "তাকলীদ হলো রক্ষাকবচ, আর ইজতিহাদ হলো অগ্রগতির চাকা।" একটি ছাড়া অন্যটি অচল।

---

## ৫১. ইলমী অঙ্গনে "হিকায়াতু হাল আল-নাস" অধ্যায়টির গুরুত্ব কী? এটি কীভাবে উম্মতের মধ্যকার বিভাজন দূর করতে সাহায্য করে?

## ( ما هي أهمية باب " حكاية حال الناس " في الساحة العلمية؟ وكيف يساعد في إزالة الانقسامات بين الأمة؟ )

ভূমিকা:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের 'হিকায়াতু হাল আল-নাস' (মানুষের অবস্থার বর্ণনা) অধ্যায়টি একটি সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দলিল। এই অধ্যায়ে শাহ

ওয়ালী উল্লাহ উম্মতের পতনের কারণ এবং বিভক্তির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ইলমী অঙ্গনে এই অধ্যায়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

**ইলমী অঙ্গনে গুরুত্ব (الأهمية العلمية):**

১. রোগের সঠিক নির্ণয় (Diagnosis):

চিকিৎসক যেমন রোগ নির্ণয় ছাড়া ওষুধ দিতে পারেন না, তেমনি সমাজের সমস্যা না বুঝলে সংস্কার করা যায় না। এই অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উম্মত সাহাবীদের যুগ থেকে সরে এসে তাকলীদ, বিদআত ও দলাদলিতে লিপ্ত হলো। এটি গবেষকদের জন্য ইতিহাসের আয়না।

২. ফিকহী বিবর্তনের ইতিহাস:

ফিকহ কীভাবে সহজ সরল অবস্থা থেকে জটিল তর্কের বিষয়ে পরিণত হলো, তার ধাপগুলো এখানে বর্ণিত হয়েছে। ইলমের ছাত্ররা এখান থেকে ফিকহের ক্রমবিকাশ জানতে পারে।

৩. সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য:

তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ কীভাবে আসল দ্বীন ছেড়ে প্রথা ও কুসংস্কারকে দ্বীন মনে করতে শুরু করেছে। এই অধ্যায়টি সত্য সন্ধানী মানুষের চোখ খুলে দেয়।

**উম্মতের বিভাজন দূর করতে ভূমিকা (دورها في إزالة الانقسامات):**

১. বিভক্তির মূল কারণ উদ্ঘাটন:

তিনি প্রমাণ করেছেন যে, উম্মতের বিভক্তির মূল কারণ হলো—'নফসানিয়াত' (স্বার্থপরতা) এবং 'আসাবিয়্যাহ' (গোঁড়ামি)। সাহাবীদের মতভেদ ছিল হকের জন্য, আর পরবর্তীদের মতভেদ জেদ ও অহংকারের জন্য। কারণ জানলে প্রতিকার সহজ হয়।

২. সালাফদের ঐক্যের নজির:

তিনি সাহাবী ও তাবেয়ীদের ঐক্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এক উম্মত ছিলেন। এটি বর্তমানের শিয়া-সুন্নি বা মাযহাবী দাঙ্গা নিরসনে মডেল হিসেবে কাজ করে।

৩. ইনসাফের শিক্ষা:

এই অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক বুঝতে পারেন যে, কোনো নির্দিষ্ট দল বা ফিরকা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ফলে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কমে আসে এবং সহনশীলতা বাড়ে।

উপসংহার:

'হিকায়াতু হাল আল-নাস' অধ্যায়টি উম্মতের জন্য একটি সতর্কবার্তা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এখানে দেখিয়েছেন যে, বিভাজন আল্লাহর আজাব ডেকে আনে। ঐক্যের পথে ফিরে আসার জন্য আত্মশুদ্ধি ও ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়াই একমাত্র পথ।

---

## ৫২. পবিত্রতা (তাহারাত) বিষয়ক শরয়ী বিধানাবলির "আসরার" (গোপন রহস্য) কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ ওযু ও গোসলের পেছনে থাকা মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

## (ما هي أسرار الأحكام الشرعية المتعلقة بـ " الطهامة " ؟ وكيف شرح الشاه ولي الله المقاصد الأساسية وراء الوضوء والغسل؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর দর্শনে, শরীয়তের প্রতিটি বিধানের পেছনে গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য বা 'আসরার' লুকিয়ে আছে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে তিনি পবিত্রতা বা 'তাহারাত' (طَهَارَة)-কে কেবল শরীর পরিষ্কার করা হিসেবে দেখেননি, বরং একে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রথম সোপান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

**পবিত্রতার (তাহারাত) আসরার বা রহস্য:**

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, তাহারাত বা পবিত্রতার মূল রহস্য হলো তিনটি:

১. **নফসের পবিত্রতা:** বাহ্যিক পানি দিয়ে ধোয়ার সাথে সাথে নফসের ভিতরের ময়লা (পাপ ও কুচিন্তা) ধুয়ে ফেলা।

২. **ফেরেশতাদের সাদৃশ্য:** ফেরেশতারা সর্বদা পবিত্র থাকেন। মানুষ যখন পবিত্র হয়, তখন সে ফেরেশতাদের গুণের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে এবং আল্লাহর রহমত তার দিকে ধাবিত হয়।

৩. **শয়তান বিতাড়ন:** নাপাকি ও দুর্গন্ধ শয়তানের প্রিয়। পবিত্রতা অর্জন করলে শয়তান দূরে পালায় এবং মানুষের ওপর তার প্রভাব কমে যায়।

ওযুর মৌলিক উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা (مقاصد الوضوء):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ওযুর অঙ্গগুলোর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন:

- **মুখ ধোয়া:** এর মাধ্যমে মানুষ গফিলতি বা উদাসীনতা দূর করে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে।
- **হাত-পা ধোয়া:** মানুষ সাধারণত হাত ও পা দিয়ে গুনাহ করে। ওযুর মাধ্যমে সে যেন সেই অঙ্গগুলোকে পাপমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করে।
- **মাথা মাসেহ:** মস্তিস্ক হলো চিন্তার কেন্দ্র। মাসেহ করার মাধ্যমে মানুষ কুচিন্তা দূর করে আল্লাহর স্মরণে মাথা নত করে।
- **ধারাবাহিকতা:** ওযু মানুষকে শৃঙ্খল ও নিয়মিত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

গোসলের মৌলিক উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা (مقاصد الغسل):

গোসল বা জানাবাত (বড় নাপাকি) থেকে পবিত্র হওয়ার রহস্য আরও গভীর:

- **পুরো শরীরের প্রভাব:** সহবাস বা নাপাকির কারণে মানুষের পুরো শরীরে এক ধরণের অলসতা ও আধ্যাত্মিক মলিনতা ছড়িয়ে পড়ে। কেবল ওযু দিয়ে তা যায় না। পুরো শরীর ধোয়ার মাধ্যমেই সেই মলিনতা দূর হয় এবং রুহ সতেজ হয়।
- **নতুন উদ্যম:** গোসল মানুষকে নতুন করে ইবাদতের জন্য চাঙ্গা করে তোলে। এটি আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার জন্য শাহী পোশাক পরার মতো প্রস্তুতি।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, ওযু ও গোসল কোনো যান্ত্রিক প্রথা নয়। এটি 'নাজামে ইলাহী' বা ঐশ্বরিক শৃঙ্খলার অংশ। যখন কোনো মুমিন ওযু করে, তখন সে মূলত তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর নূরে আলোকিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এটিই তাহারাতের প্রকৃত 'সির' বা রহস্য।

---

## ৫৩. নামাজ (সালাত)-এর দৈহিক ও আত্মিক রহস্যগুলো কী কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ কেন নামাজকে ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন? (ما هي الأسرار الجسدية والروحية للصلاة؟ ولماذا أعطى الشاه ولي الله الصلاة المكانة الأسمى بين العبادات؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের স্তম্ভগুলোর মধ্যে ঈমানের পরেই নামাজের স্থান। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে নামাজের হিকমত ও রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক অনবদ্য দার্শনিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, নামাজ হলো বান্দার রুহানি উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।

**নামাজের আত্মিক রহস্য (الأسرار الروحية):**

১. ইখবাত বা বিনয়:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, নামাজের মূল রুহ হলো 'ইখবাত' (إخبات) বা বিনয়। বান্দা যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায়, তখন সে আল্লাহর মহত্ত্বের সামনে নিজের আমিত্বকে বিলীন করে দেয়। এটি অন্তরের অহংকার চূর্ণ করে।

২. মুনাজাত বা গোপন কথোপকথন:

হাদিসে এসেছে, "নামাজ হলো আল্লাহর সাথে গোপন কথা বলা।" শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, নামাজি ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হন যেন তিনি আল্লাহকে দেখছেন (ইহসান)। এই আধ্যাত্মিক সংযোগ আত্মাকে প্রশান্ত করে।

৩. জিকির ও ফিকির:

নামাজের প্রতিটি রুকন (কিয়াম, রুকু, সিজদা) আল্লাহর জিকিরে পরিপূর্ণ। এটি মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

## নামাজের দৈহিক রহস্য (الأسرار الجسدية):

১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্য:

অন্তরের বিনয় প্রকাশের জন্য দৈহিক বিনয় জরুরি। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন:

- **কিয়াম (দাঁড়ানো):** আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর সম্মানের প্রতীক।
- **রুকু ও সিজদা:** শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অংশ (মাথা) মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ করা। এর মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহর ইবাদতে শরিক হয়।

২. শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ:

জামাতের সাথে নামাজ পড়া, ইমামের অনুসরণ করা এবং কাতার সোজা রাখা—এগুলো মানুষকে দৈহিক ও সামাজিকভাবে সুশৃঙ্খল করে।

## কেন নামাজকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন? (لماذا هي الأسمى):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ নামাজকে **'আ'জামুল ইবাদাত'** (সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত) বলার কারণগুলো হলো:

১. **তিনটি গুণের সমন্বয়:** নামাজের মধ্যে **'তাহারাত'** (পবিত্রতা), **'ইখবাত'** (বিনয়) এবং **'জিকির'** (স্মরণ)—এই তিনটি গুণ একসাথে পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো ইবাদতে নেই।

২. **ফেরেশতাদের সাদৃশ্য:** নামাজি ব্যক্তি ফেরেশতাদের মতো কখনো রুকুতে, কখনো সিজদায় থাকে। এটি মানুষকে **'আলমে মালাকুত'**-এর সাথে যুক্ত করে।

৩. **গুনাহ মাফ:** নামাজ দৈনিক পাঁচবার আত্মাকে ধৌত করে, যা গুনাহের প্রভাব মুছে ফেলে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, নামাজ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি "মি'রাজুল মুমিনীন"। এটি মানুষকে পাশবিক স্তর থেকে উঠিয়ে ফেরেশতাদের স্তরে পৌঁছে দেয়। তাই ইবাদতের জগতে নামাজের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

---

## ৫৪. যাকাত-এর বিধান ও এর দর্শন সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী আলোচনা করেছেন? এটি কীভাবে মানুষের অন্তরে "সামাহাত" (উদারতা) সৃষ্টি করে? (ما الذي ناقشه الشاه ولي الله حول حكم الزكاة وفلسفتها؟ وكيف تخلق " السماحة " في قلب الإنسان؟)

ভূমিকা:

যাকাত ইসলামি অর্থনীতির মূলভিত্তি এবং আত্মশুদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) যাকাতকে কেবল গরিবের সাহায্য হিসেবে দেখেননি, বরং তিনি একে ধনী ব্যক্তির আত্মিক রোগ নিরাময়ের মহৌষধ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যাকাতের বিধান দেওয়া হয়েছে মূলত অন্তরের কার্পণ্য দূর করার জন্য।

### যাকাতের বিধান ও দর্শন (حكم الزكاة وفلسفتها):

১. সম্পদের মোহ দূরীকরণ:

মানুষ স্বভাবতই সম্পদকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা 'লোভ' ও 'কৃপণতায়' রূপ নেয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, যাকাতের দর্শন হলো—সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে অন্তরের এই অতিরিক্ত মোহ কমানো।

২. শুকরিয়া আদায়:

সম্পদ আল্লাহর নিয়ামত। যাকাত হলো সেই নিয়ামতের শুকরিয়া। শারীরিক নিয়ামতের শুকরিয়া হলো নামাজ, আর আর্থিক নিয়ামতের শুকরিয়া হলো যাকাত।

৩. সমাজের কল্যাণ (মাসলাহাত):

যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দুর্বল, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়। এটি ধনী-গরিবের ব্যবধান কমায় এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

## যাকাত কীভাবে "সামাহাত" (উদারতা) সৃষ্টি করে?

১. নফসের চিকিৎসা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, মানুষের নফসের একটি বড় রোগ হলো 'শুকখ' (شُحّ) বা কৃপণতা। এটি মানুষকে পশুত্বের দিকে টানে। যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার প্রিয় বস্তু (টাকা) ত্যাগ করে। বারবার ত্যাগের ফলে অন্তরে 'সামাহাত' বা উদারতার গুণ তৈরি হয়।

২. উদারতার প্রভাব:

সামাহাত মানুষকে কেবল দানি বানায় না, বরং তাকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। যার মধ্যে সামাহাত আছে, সে মৃত্যুর সময় দুনিয়া ছাড়তে কষ্ট পায় না, কারণ তার মন আখেরাতের দিকে ধাবিত থাকে।

৩. সম্পদের পবিত্রতা:

কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন।" (সূরা তাওবা)। যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে এবং অবশিষ্ট সম্পদে বরকত নিয়ে আসে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশ্লেষণে, যাকাত হলো একটি দ্বিমুখী কল্যাণ। একদিকে এটি সমাজের অভাব দূর করে (সামাজিক উপকার), অন্যদিকে এটি দাতার অন্তরকে কৃপণতার রোগ থেকে মুক্ত করে উদার বা 'সখি' বানায় (আধ্যাত্মিক উপকার)।

## ৫৫. রোজা (সাওম)-এর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যগুলো কী কী? শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ বিষয়ে কী ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

## (ما هي الأسرار الجسدية والروحية الكامنة وراء حكم " الصوم " ؟ وما هو نوع الشرح الذي قدمه الشاه ولي الله في هذا الصدد؟)

ভূমিকা:

রোজা বা সাওম হলো নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এক অনন্য প্রশিক্ষণ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে রোজার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের 'পাশবিকতা' (বাহিমিয়্যাহ) এবং 'ফেরেশতাত্ব' (মালাকিয়্যাহ)-এর দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে এনেছেন।

**রোজার আধ্যাত্মিক রহস্য (الأسرار الروحية):**

১. পাশবিকতা দমন (কাসরুশ শাহওয়াত):

মানুষের কুপ্রবৃত্তির মূল উৎস হলো—খাদ্য, পানীয় এবং যৌনতা। এগুলো মানুষকে পশুর মতো বানিয়ে ফেলে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, রোজার মাধ্যমে এই তিনটি চাহিদাকে দিনের বেলা বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে মানুষের পাশবিক শক্তি দুর্বল হয় এবং রুহানি শক্তি বা 'মালাকিয়্যাহ' প্রবল হয়।

২. ফেরেশতাদের সাদৃশ্য:

ফেরেশতারা পানাহার ও যৌনতা মুক্ত। রোজাদার ব্যক্তিও সারাদিন এই কাজগুলো থেকে বিরত থেকে ফেরেশতাদের গুণের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে। এটি তাকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে দেয়।

৩. শয়তানের পথ সংকীর্ণ করা:

হাদিসে আছে, "শয়তান মানুষের ধমনীতে রক্তপ্রবাহের ন্যায় চলে। তোমরা ক্ষুধা দিয়ে তার পথ সংকীর্ণ কর।" রোজা শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূর করার মোক্ষম হাতিয়ার।

**রোজার শারীরিক ও সামাজিক রহস্য (الأسرار الجسدية):**

১. সহমর্মিতা শিক্ষা:

ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিরা গরিবের ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে। এতে সমাজে দয়া ও সহমর্মিতা বাড়ে।

২. স্বাস্থ্যের উন্নতি:

আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, রোজা শরীরের টক্সিন দূর করে এবং পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ একে 'রিয়াজাত' বা দৈহিক অনুশাসন হিসেবেও দেখেছেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর ব্যাখ্যার ধরন:

তিনি রোজাকে কেবল উপবাস হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, রোজার আসল উদ্দেশ্য হলো—অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া। মানুষ সাধারণত তার অভ্যাসের (পানাহারের) গোলাম। রোজা মানুষকে শেখায় যে, আল্লাহর হুকুমের সামনে অভ্যাস ত্যাগ করাই হলো প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, রোজা হলো মানুষের ভিতরের পশুকে বশ করার লাগাম। এটি আত্মাকে রিপুর অন্ধকার থেকে বের করে নূরের জগতে নিয়ে যায়।

---

## ৫৬. জীবিকার (মাঈশা) বিধানাবলি ও রিযিক তালাশ (ইবতিগাউর রিযক)-এর ক্ষেত্রে শরীয়তের রহস্য কী? কর্ম ও জীবিকা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা আলোচনা কর। (ما هي أسرار الشريعة في أحكام " المعيشة " و " ابتغاء الرزق " ؟ ناقش شرحه حول العمل والرزق)

ভূমিকা:

ইসলাম বৈরাগ্যবাদের ধর্ম নয়। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বয়ের নাম। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে 'ইবতিগাউর রিযক' (জীবিকা অন্বেষণ)-কে ইবাদতের সহায়ক এবং মানব সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জীবিকার বিধানগুলোকে 'ইরতিফাকাত' বা সমাজোন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন।

**জীবিকার বিধানের শরয়ী রহস্য (أسرار المعيشة):**

১. ইবাদতের শক্তি অর্জন:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, মানুষের শরীর ও রুহ একে অপরের সাথে জড়িত। ইবাদত করার জন্য শারীরিক শক্তি প্রয়োজন, আর শক্তির জন্য হালাল জীবিকা প্রয়োজন। তাই হালাল উপার্জন করাও একটি ইবাদত। হাদিসে আছে, "হালাল উপার্জন করা ফরজ ইবাদতের পরে আরেকটি ফরজ।"

২. পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি:

যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতে (ভিক্ষা করে), সে নিজের সম্মান নষ্ট করে এবং সমাজে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "নিজ হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।"

৩. সামাজিক সহযোগিতা (তা'আউন):

সমাজ টিকে থাকে একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে। জীবিকার এই ভিন্নতা আল্লাহর হিকমত। এর মাধ্যমে 'ইরতিফাকাত' বা সভ্যতা গড়ে ওঠে।

**কর্ম ও জীবিকা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা:**

ক. কাসব বা পেশার গুরুত্ব:

তিনি বলেন, কোনো পেশাই ছোট নয় (যদি তা হালাল হয়)। তিনি সাহাবী ও নবীদের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই কোনো না কোনো পেশায় (যেমন—রাখাল, ব্যবসায়ী) যুক্ত ছিলেন।

খ. নিষিদ্ধ পন্থার রহস্য:

সুদ, জুয়া, ধোঁকাবাজি এবং মজুতদারি হারাম হওয়ার কারণ হলো—এগুলো সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "জীবিকা হতে হবে পবিত্র, যাতে তা থেকে উৎপন্ন রক্ত ও মাংস ইবাদতের উপযোগী হয়।"

গ. মধ্যপন্থা (ইকতিসাদ):

তিনি জীবিকা অর্জনে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সারাদিন দুনিয়ার পেছনে ছুটে আখেরাত ভুলে যাওয়া যেমন খারাপ, তেমনি পরিবারকে উপোস রেখে মসজিদে বসে থাকাও খারাপ। তিনি 'ইকতিসাদ' বা মধ্যপন্থার উপদেশ দিয়েছেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে, জীবিকা তালাশ করা কেবল পেট ভরার জন্য নয়, বরং এটি দ্বীন পালনের একটি মাধ্যম। হালাল রিজিক মানুষের ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত এবং সমাজের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

---

## ৫৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে "বাব আসরার মা জা'আ আনিন নাবী" (নবী থেকে আগত যাবতীয় জ্ঞানের রহস্য অধ্যায়ে) ইবাদতের ক্ষেত্রে "তাফাক্কুহ" (গভীর উপলব্ধি)-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন?

**(كيف أبرز الشاه ولي الله ضرورة " التفقه " في العبادات في " باب أسرار ما جاء عن النبي (ص) " ؟)**

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হলো 'বাব আসরার মা জা'আ আনিন নাবী' (নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত বিষয়াদির রহস্য)। এই অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের বিধান পালন করা কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর জ্ঞান বা 'তাফাক্কুহ' (التَّفَقُّهُ)। ইবাদতের রুহ বা প্রাণ রক্ষা করতে হলে এই তাফাক্কুহ অপরিহার্য।

**তাফাক্কুহ-এর প্রয়োজনীয়তা (ضرورة التفقه):**

১. ইবাদতের উদ্দেশ্য অনুধাবন:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, রাসূল (সা.) উম্মতকে কেবল নামাজের রুকু-সিজদা শেখাননি, বরং নামাজের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর সামনে বিনয় (ইখবাত) প্রকাশ করতে হয়, তাও শিখিয়েছেন। এই 'কেন' এবং 'কীভাবে'-এর জ্ঞানই হলো তাফাক্কুহ। তাফাক্কুহ ছাড়া ইবাদত নিছক অভ্যাসে পরিণত হয়।

২. অন্তরের উপস্থিতি (হুযুরুল কালব):

তিনি বলেন, তাফাক্কুহ মানুষকে ইবাদতের সময় সচেতন রাখে। যখন বান্দা জানে যে ওযুর মাধ্যমে তার গুনাহ ঝরে যাচ্ছে, তখন তার ওযুর মান উন্নত হয়। আর যে জানে না, তার কাছে এটি কেবল হাত-মুখ ধোয়া।

৩. হাদিসের সঠিক প্রয়োগ:

রাসূল (সা.)-এর হাদিসগুলোর মর্মার্থ বোঝার জন্য তাফাক্কুহ জরুরি। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, অনেক হাদিসে রূপক অর্থ বা বিশেষ প্রেক্ষাপট থাকে। গভীর উপলব্ধি ছাড়া হাদিসের ওপর আমল করতে গেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

৪. জাহির ও বাতিন এক করা:

তাফাক্কুহ মানুষকে শরীয়তের বাহ্যিক রূপ (জাহির) এবং আধ্যাত্মিক রূপ (বাতিন)-এর মধ্যে সংযোগ ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন—হজ কেবল ভ্রমণ নয়, বরং এটি আল্লাহর প্রেমে ঘর ছাড়ার প্রতীক—এই বোধ কেবল ফকীহ বা জ্ঞানীর থাকে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, দ্বীনের মধ্যে 'তাফাক্কুহ' বা গভীর বুঝ অর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য জরুরি। কারণ, "যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া ইবাদত করে, সে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি করে।" তাফাক্কুহ ইবাদতকে জীবন্ত ও ফলপ্রসূ করে।

---

**৫৮. এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন ইবাদতের রহস্যগুলো কি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত? তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।**
**(هل الأسرار المذكورة في هذا الباب للعبادات المختلفة مترابطة مع بعضها البعض؟ حلل العلاقة بينها)**

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে বিভিন্ন ইবাদত (নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ)-এর যে রহস্য বা 'আসরার' বর্ণনা করেছেন, তা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বরং এই সবগুলোর মূল লক্ষ্য এক এবং এরা একে

অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করলেই শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে।

**ইবাদতের রহস্যগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক (العلاقة بين أسرار العبادات):**

১. লক্ষ্যগত ঐক্য (মাকসাদ এক):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেখিয়েছেন যে, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকলেও সবার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো—'তাযকিয়ায়ে নফস' (আত্মশুদ্ধি) এবং 'আল্লাহর নৈকট্য লাভ'।

- নামাজ অহংকার দূর করে।
- যাকাত কৃপণতা দূর করে।
- রোজা প্রবৃত্তি দমন করে।

সবগুলো মিলে মানুষকে 'ইনসানে কামিল' বা পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে।

২. একে অপরের পরিপূরক:

তিনি বলেন, এক ইবাদতের রহস্য অন্য ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করে।

- **শারীরিক ও আর্থিক সমন্বয়:** নামাজ ও রোজা শারীরিক ইবাদত যা নফসকে বশ করে। আর যাকাত আর্থিক ইবাদত যা দুনিয়ার মোহ দূর করে। মানুষের পূর্ণতার জন্য শরীর ও অর্থ উভয়ের কুরবানি প্রয়োজন। তাই এদের সম্পর্ক পরিপূরক।

৩. আখলাকে আরবা'আ (চারিত্রিক গুণ) অর্জনে সহায়তা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, সব ইবাদত মিলে মানুষের মধ্যে চারটি মৌলিক গুণ তৈরি করে:

- ওযু ও গোসল ⟶ **তাহারাত** (পবিত্রতা)।
- নামাজ ও জিকির ⟶ **ইখবাত** (বিনয়)।
- যাকাত ও দান ⟶ **সামাহাত** (উদারতা)।
- রোজা ও মু'আমালাত ⟶ আদালাত (ন্যায়বিচার)।

এই চারটি গুণ একে অপরের সাথে চেইন বা শিকলের মতো যুক্ত। পবিত্রতা ছাড়া বিনয় আসে না, আর উদারতা ছাড়া ন্যায়বিচার সম্ভব নয়।

৪. ইরতিফাকাত বা সমাজ গঠনে ভূমিকা:

ব্যক্তিগত ইবাদতগুলো সমষ্টিগতভাবে একটি সুস্থ সমাজ (মিল্লাত) গঠন করে। যেমন—জামাতে নামাজ ঐক্যের প্রতীক, আর যাকাত সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক। ব্যক্তিগত 'আসরার' শেষ পর্যন্ত সামাজিক কল্যাণে মিলিত হয়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের বিধানগুলো একটি মানবদেহের মতো। হাত, পা ও চোখ যেমন আলাদা হয়েও এক দেহের অংশ, তেমনি নামাজ, রোজা ও হজের রহস্যগুলো আলাদা হয়েও এক 'দ্বীন'-এর অংশ। এদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

---

## ৫৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ইবাদতের এ "আসরার" বা গোপন রহস্য জানা একজন মুমিনের জীবনে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে? (ما هو نوع التغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه معرفة هذه " الأسرار " في حياة المؤمن عند الشاه ولي الله؟)

ভূমিকা:

মানুষ স্বভাবতই কৌতুহলী। সে যখন কোনো কাজের কারণ বা উপকারিতা জানে, তখন সে কাজটি আগ্রহের সাথে করে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) মনে করেন, ইবাদতের 'আসরার' বা রহস্য জানা থাকলে মুমিনের ইবাদত এবং সামগ্রিক জীবনে এক বৈপ্লবিক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

**জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ (التغييرات الإيجابية):**

১. ইবাদতে স্বাদ ও আগ্রহ বৃদ্ধি (Halawatul Imaan):

যখন মুমিন জানে যে, সিজদা করলে তার অহংকার চূর্ণ হয় এবং সে আল্লাহর পায়ের কাছে পৌঁছায়, তখন সিজদা তার কাছে বোঝা মনে হয় না, বরং আনন্দের

বিষয় হয়। রহস্য জানলে ইবাদতের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং অন্তরে স্বাদ (হালওয়াত) অনুভূত হয়।

২. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা তৈরি:

রহস্য না জানলে মানুষ ইবাদত করে লোকলজ্জায় বা অভ্যাসের বশে। কিন্তু যখন সে জানে যে যাকাত তার অন্তরের কৃপণতা দূর করছে, তখন সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান করে। আসরার জ্ঞান মানুষকে রিয়াকার (লোকদেখানো) হওয়া থেকে বাঁচায়।

৩. দৃঢ়তা ও ইস্তিকামাত:

আধুনিক যুগে নাস্তিক্যবাদ ও যুক্তিবাদীরা ইবাদত নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যে মুমিন শরীয়তের হিকমত ও যুক্তি জানে, তার ঈমান কোনো সন্দেহের ঝড়ে টলে না। সে আত্মবিশ্বাসের সাথে দ্বীন পালন করে।

৪. আমলের মান উন্নয়ন:

একজন সাধারণ মানুষ নামাজ পড়ে কেবল দায়সারাভাবে। কিন্তু 'আসরার' জানা ব্যক্তি নামাজ পড়ে খুশু-খুজুর সাথে। সে প্রতিটি রুকনের হক আদায় করে। ফলে তার আমলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৫. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি:

যখন বান্দা বোঝে যে, আল্লাহ তায়ালা এই বিধানগুলো তার নিজের (বান্দার) কল্যাণের জন্যই দিয়েছেন, তখন আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। সে আল্লাহকে কেবল 'হাকিম' (আদেশদাতা) নয়, বরং 'রহিম' (দয়ালু) হিসেবে চিনে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ইবাদতের রহস্য জানা হলো 'মারেফাত'-এর অংশ। এটি মুমিনকে অন্ধ অনুসারী থেকে সচেতন ইবাদতগুজারে পরিণত করে। এর ফলে তার পুরো জীবন ইবাদতের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

## ৬০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে শরীয়তের বাহ্যিক বিধান (জাহির) ও অন্তর্নিহিত রহস্যের (বাতিন) মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন?
## (كيف حاول الشاه ولي الله التوفيق بين الحكم الظاهر للشريعة وأسرارها الباطنة؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর যুগে উলামা সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল (জাহেরী) কেবল শরীয়তের বাহ্যিক শব্দ ও নিয়ম নিয়ে পড়েছিল, অন্যদল (সুফি/বাতেনী) শরীয়ত বাদ দিয়ে কেবল মারেফতের দাবি করত। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই দুই চরমপন্থার মধ্যে 'জাহির' ও 'বাতিন'-এর এক অপূর্ব সমন্বয় বা 'তাতবীক' সাধন করেছেন।

**জাহির ও বাতিনের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি (منهج التوفيق):**

১. দেহ ও প্রাণের সম্পর্ক:

তিনি শরীয়তের বাহ্যিক বিধানকে (জাহির) দেহ এবং এর রহস্যকে (বাতিন) প্রাণ হিসেবে তুলনা করেছেন।

- **যুক্তি:** প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন লাশ, তেমনি আসরার ছাড়া আমল মূল্যহীন। আবার দেহ ছাড়া প্রাণ যেমন দুনিয়াতে থাকতে পারে না, তেমনি শরীয়তের বিধান (নামাজ, রোজা) ছাড়া মারেফাত বা বাতিন অর্জন করা অসম্ভব।

২. শরিয়ত ও তরিকতের মিলন:

তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শরিয়ত (জাহির) এবং তরিকত (বাতিন) আলাদা কিছু নয়।

- **ব্যাখ্যা:** শরিয়ত হলো রাস্তা, আর তরিকত হলো সেই রাস্তায় চলার আদব ও গন্তব্য। তিনি বলেন, **"যে সুফি শরীয়ত মানে না, সে জিন্দিক (ধর্মত্যাগী)। আর যে আলেম বাতিন খোঁজে না, সে অপূর্ণ।"**

৩. ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ রূপ:

তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিটি ইবাদতের দুটি দিক আছে।

- **জাহিরঃ** ওযুর সময় হাত-মুখ ধোয়া।
- বাতিনঃ ওযুর সময় গুনাহ ধুয়ে ফেলার নিয়ত করা এবং তওবা করা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, কামিল মুমিন তিনি, যিনি হাত ধোয়ার সময় মনও ধুয়ে ফেলেন। এভাবেই তিনি জাহির ও বাতিনকে এক করেছেন।

৪. বাড়াবাড়ি রোধঃ

যারা বাতিনের নামে শরীয়ত ত্যাগ করত (যেমন—নামাজ না পড়ে ধ্যানে বসা), তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর চেয়ে বড় বাতেনী আর কেউ নেই, অথচ তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জাহেরি নামাজ ছাড়েননি। তাই জাহির ত্যাগ করে বাতিন পাওয়া শয়তানের ধোঁকা।

উপসংহারঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন হলো—"জাহির ও বাতিনের সমন্বয়ই হলো সিরাতুল মুস্তাকিম।" তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, শরীয়তের খোসা (জাহির) এবং শাঁস (বাতিন)—উভয়টিই সংরক্ষণ করতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি টিকতে পারে না।

---